নেহেরু বাল পুস্তকালয়

NEHRU BAL PUSTAKALAYA

হরদম হুঁশিয়ার



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া



নেহেরু বাল পুস্তকালয়-37

হরদম হুঁশিয়ার

উমা আনন্দ

ছবি

বৈজয়ন্তী রানাডে

অনুবাদ

ক্ষিতীশ রায়



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া—নয়া দিল্লি

1979 (শকাব্দ 1900)

BE PREPARED (*Bengali*)

Published by the Director, National Book Trust, India, A-5, Green Park, New Delhi-110016 and text printed at Rekha Printers Private Limited, New Delhi-110020. Cover and illustrations printed at Thomson Press, Faridabad, Haryana.



দুই বন্ধু

ঢং ঢং করে ছুটির ঘন্টা বাজল। তার রেশটুকু মিলিয়ে যেতে না যেতেই একাধিক ক্লাশরুমের দরজা সশব্দে খুলে গেল। খাঁচা থেকে ছাড়া-পাওয়া পাখির মতো বেরিয়ে এল ছেলের দল হাসি মুখে কলরব করতে করতে।

সিঁড়ির মাথায় পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দুই বন্ধুর—কপিল ও নবীনের।

কপিল মাথায় একটু বড়ো, মুখে তার হাসি লেগেই আছে। নবীনকে সে বলল, বাব্বাঃ বাঁচা গেল, পরীক্ষার পালা আজ চুকল।

নবীন একটু রোগাপানা, একটু যেন গম্ভীর, কথায় কথায় হাসে না কপিলের মতো। নবীন বলল, আরে কপিল যে! ছুটিতে এবার বুঝি যাবে স্কাউট ক্যাম্প্-এ ?

না ভাই, এ বছর যেতে পারছি আর কই। সিমলার কাছে তারায় আমার কাকা থাকেন, তাঁর ওখানে যাব। আমাদের স্কাউট মাষ্টার এবার অন্য দু-দল প্যাট্রোল নিয়ে ক্যাম্প করতে বেরোবেন। আমাদের পালা করে যেতে হয়। সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে না থেকে যদি তুমি স্কাউট হতে বেশ হত। তাহলে একটু শক্তপোক্ত হতে।

স্কাউটিং করতে আর পারলাম কই ? তুমি তো জানো ভাই, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে প্রতিদিন সন্ধেবেলা আমায় বসতে হয় বাবার দোকানে।

কপিল চুপ করে গেল। সে-দিন সন্ধ্যায় সে তার বাবাকে বলল, আচ্ছা বাবা, নবীন যদি আমার সঙ্গে তারায় যায় বিজয়কাকা বিরক্ত হবেন না তো ?

তাঁকে একটা পোষ্টকার্ড লিখে জেনে নিলেই পারো।

কপিল বাবার কথামতো কাকাকে চিঠি পাঠিয়ে অধীর হয়ে জবাবের অপেক্ষা করতে লাগল।

জবাব এল তিন দিন বাদে, বিজয়কাকা লিখেছেন :
স্নেহের কপিল,

তোমার বন্ধু এলে তো ভালোই হয়। তোমরা ছুটিতে চিলেকোঠায় থাকতে পারবে। তোমার যখন বন্ধু, নবীন নিশ্চয় ভালো একজন স্কাউট। এই ছুটিতে দুজন মিলে 'ক্যাম্পাস ব্যাজ্'-এর জন্য তৈরি হতে পারবে। তোমার বোন রেখা তো এখন পুরোদস্তুর গার্ল গাইড্। 'কুকিং ব্যাজ্' পাবার জন্য এখন সে উঠে পড়ে লেগেছে। কাল রাতে সে আমাদের আলুভাজা ও মটরশুঁটির পোলাও রেঁধে খাওয়ালে। ভাজাটা একটু পুড়ে গিয়েছিল, পোলাওটাও সামান্য ধরে গিয়েছিল। মুখে কিন্তু বলতে হল চমৎকার রান্না। শাসিয়ে রেখেছে আরেক দিন রেঁধে খাওয়াবে, সুতরাং তৈরি থেকো।

মা-বাবাকে আমাদের প্রীতি-ভালোবাসা জানিয়ো।

তাহলে আগামী রোববার তোমরা দুজনে আসছ তো ?

ইতি তোমার কাকা
বিজয় কাপুর

কাকার চিঠি পেয়ে কপিল আহ্লাদে আটখানা। তার আর তর সইছিলনা। মাকে বলল, আমি এখুনি গিয়ে নবীনকে বলে আসি।

নবীনদের দোকানটা কার্ণাল বাজারে। ওই বাজারে যেতে কপিলের খুব ভালো লাগে। ওখানে কেবল আটা, ময়দা, সুজি ও মিষ্টি বিস্কুট বিক্রি হয়। কারখানার বিস্কুট সেঁকার গন্ধটা বেশ। বাজারে কত লোকের আনাগোনা!

কপিল বাজারে গিয়ে দেখল দোকানে নবীন একাই বসে আছে। বন্ধুকে দেখে নবীন খুব খুশি হয়ে বলল, কি আশ্চর্য! তুমি এ সময়ে ?

এইমাত্র যে তোমার নেমন্তন্নের চিঠি এল।

নেমন্তন্ন ? আমায় আবার চিঠি পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করবে কে ? নবীন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

সেদিন তোমায় বলেছিলাম না, এবার আমি তারায় কাকার বাড়িতে ছুটি কাটাতে যাব। সিমলার কাছাকাছি একটা স্কুলে কাকা পি. টি. শেখান, উপরন্তু তিনি সেখানকার এ্যাসিসটেন্ট স্কাউট মাষ্টার। লিখেছেন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। উনি ভেবেছেন তুমিও আমার মতো একজন স্কাউট। তোমার মা-বাবা তোমায় যেতে দিতে আপত্তি করবেন না তো ?

আশা তো করি করবেন না। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে যেতে। পাহাড়ে জায়গা আমি কখনো দেখিনি। চলোনা একবার বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

ওদের বাসাটা দোকানের লাগোয়া। আশ্চর্যের বিষয়, কপিলের মুখে সব কথা শুনে নবীনের বাবা-মা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। কপিলকে ওর বাবা বল্লেন, নবীনের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের মাঝে মাঝে ভাবনা হয়। হাওয়া বদল করলে ওর শরীর ভালো হতে পারে। কাকাকে জানিয়ো উনি যে ওকে যেতে বলেছেন—এতে আমরা খুবই খুশি হয়েছি।

কপিল বলল, আমরা তাহলে রোববার সকাল ছ'টার বাস ধরব। দুপুর নাগাদ তারায় পেঁ ৗছে যাব। বাস ষ্টেশন থেকে মাত্র এক ফার্লং চড়াই পথের উপর কাকার বাংলো। কাকিমার গোয়ালে গোরু আছে, বাগানে শাকসবজি হয়। আপনারা নবীনের জন্য একটুও ভাববেন না। দেখবেন এমনভাবে ওর দেখাশোনা করব যে ও বেশ মোটাসোটা হয়ে ফিরবে।





কাব্ ও স্কাউট

রবিবার সকালবেলা ছ'টার একটু আগে দুই বন্ধু মিলিত হল বাস ষ্টেশনে। কপিলের কাঁধে একটি ছিমছাম হ্যাভারস্যাক্ ও হাতে ছোট একটি স্যুটকেস। নবীন সঙ্গে এনেছে যেমন তেমন করে বাঁধাছাঁদা কয়েকটা পোঁটলাপুঁটলি।

বাস্‌রে, এত সব কী এনেছো নবীন? এই বলে কপিল বাসের উপর উঠে মালপত্তর টেনে তুলল আর সীটের নিচে সব গুছিয়ে রাখতে লাগল।

একটা মস্ত ঝুড়ি টেনে তুলে নবীন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মায়ের কাণ্ড! আমার জামাকাপড় তো ওই ছোট টিনের বাক্সটাতে সব এঁটে গেছে। বাদবাকি আর সব জিনিস মা দিয়ে দিয়েছেন তোমার কাকিমার জন্য। ঝুড়িটা আমে ভরতি, ওই টিনের



পেটিটাতে হরেক রকমের বিস্কুট আর এই থলের মধ্যে আছে এক তাল নতুন মাড়াই— আখের গুড়।

কপিল হাসতে হাসতে বলল, তারায় পৌঁছে গেলে ওগুলো তো আমাদেরই ভোগে লাগবে সুতরাং বয়ে নিয়ে যেতে বেজার হওয়া কাজের কথা নয়।

ঠিক সেই সময়ে বাস্-কণ্ডাক্টারের হুইসিল বেজে উঠল, প্যাসেঞ্জাররা হুড়মুড়



করে যেযার জায়গায় বসে পড়তেই মস্ত বড় বাসখানা চলতে শুরু করল। দুই বন্ধুতে জিনিসপত্তর গুছিয়ে বেশ আরামে যখন বসেছে নবীন বলল, তুমি বলছিলে তোমার বিজয়কাকা ভেবেছেন আমিও বুঝি স্কাউট্। আমায় দেখে তিনি হয়তো হতাশ হবেন। আচ্ছা স্কাউট্ হয়েছো বলে তোমায় কি করতে হয় আমায় একটু বুঝিয়ে বলোতো।

এই তো বছর দুই হল আমি স্কাউট্ হয়েছি। কিছুকাল আগে আমি স্কাউট্দের সেকেণ্ড ক্লাস টেষ্ট পাশ করেছি। তার মানে আমি এখন আকস্মিক দুর্ঘটনায় কিভাবে ফার্স্ট এইড্ দিতে হয় অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হয়, তার কিছুটা শিখেছি আরো কিছু বিষয়ের সঙ্গে শিখেছি সিগন্যালিং—পতাকা হাতে নিয়ে কিভাবে সঙ্কেত পাঠাতে হয়। কিন্তু নবীন, তুমি হয় তো জানো স্কাউট হবার আগে আমি ছিলাম কাব্।

কাব্? সে আবার কি?

অল্প বয়সের স্কাউট্কে বলে কাব্। তাদের দলকে বলা হয় প্যাক্। আমাদের স্কুলে কাব্দের যে প্যাক্ আছে তাতে যখন আমি যোগ দিয়েছিলাম তখন আমার বয়স ছিল সাত। বারো বছর যখন আমার বয়স হল তখন আমি স্কাউট হলাম। কাব্ হওয়াটা বেশ মজার ব্যাপার। একটি এদেশী ছেলের কাহিনী পড়ে সর্বপ্রথম কাব্-দের দল গঠনের কথা লর্ড বাডেন্পাওয়েলের মনে জাগে।

লর্ড বাডেনপাওয়েল? কে তিনি? কোন্ কাহিনী শুনেছিলেন তিনি?

1907 সালে স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন লর্ড রবার্ট বাডেন-পাওয়েল। জাতিতে তিনি ইংরেজ। তিনি দেখেছিলেন আমাদের মতো শহুরে ছেলেরা বনজঙ্গল, গাছপালা, পশুপাখি বিষয়ে খুব সামান্যই জানে। বনজঙ্গলে গেলে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি, কী করতে হবে না হবে কিছু আমরা বুঝতে পারিনা। তিনি চেয়েছিলেন ছেলেরা যেন আত্মনির্ভর হয়, অপরের প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ভেবেছিলেন এসব ব্যাপার ছেলেরা ছোট থাকতেই যদি শিখে নিতে পারে তাহলে বড়ো হয়ে তারা দেশের কাজে এগিয়ে আসতে পারবে। আজকাল পৃথিবীর নানাদেশেই স্কাউট্ দেখতে পাওয়া যায়। স্কাউট-আন্দোলন এখন সারা বিশ্বে পরস্পরের কাছে রাখীবন্ধনের মতো।

সেই যে ভারতীয় ছেলেটির কাহিনী—সেটি লিখেছিলেন আরেকজন ইংরেজ। নাম তাঁর রুডইয়ার্ড কিপলিং। বহুদিন এদেশে ছিলেন তিনি। 'দি জাঙ্গল বুক' নামে তিনি একটি বই লিখেছিলেন, সে বই তুমি পড়োনি?

না তো, তবে আমি পড়তে চাই। কী নিয়ে লেখা সে গল্প ?

বিজয়কাকার কাছে নিশ্চয় এক কপি আছে। তরায় গিয়ে বইটা পড়ে ফেলতে পারবে। গল্পটা লেখা মৌগ্লিকে নিয়ে। সে এক গাঁয়ের ছেলে, তবে মানুষ হয়েছিল নেকড়ে বাঘের পরিবারে।

তাই না কি ? কী করে তা হল ?

মৌগলিকে নিয়ে তার মা বাবা গিয়েছিল জঙ্গলে। তখন সে নিতান্তই শিশু, হামাগুড়ি দিতে পারে মাত্র। জঙ্গলে ছাউনি বেঁধে মৌগলিরা তো রয়েছে। এক রাতে ছাউনির কাছে গুঁড়ি মেরে এল শেরখান নামে এক বাঘ। মৌগলিকে নিয়ে ছাউনির সামনে কাঠকুটো জ্বেলে বাপ-মা খানিকক্ষণ আগুন পোহাল। তারপর তাত কমে যেতে ছাউনিতে ঢুকল শুতে। সেই ফাঁকে শেরখান মেরেছে এক লাফ। একটা থাবা জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর পড়তেই বাঘ বেচারা যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে উঠল। বাঘের গর্জনে সকলের ঘুম গেল ভেঙে! তারপর যে হট্টগোল শুরু হল সেই চেঁচামেচি ছুটোছুটির মধ্যে মৌগ্লি কখন যেন হামা দিয়ে ঢুকে গেল ছাউনির পাশের ঘন জঙ্গলে। অনেক খোজাখুঁজি হল কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না। একটি মা নেকড়ে মানুষের ছানাটিকে দেখতে পেয়ে, মুখে করে তাকে নিয়ে এল নিজের গুহায়। মৌগলি তো শিশু, তার ভয়-ডর ছিল না, সে দিব্যি নেকড়ের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতে লাগল। ওই নেকড়ে পরিবারেই সে মানুষ হল, একটু বড়ো হয়ে ওই 'কাব্‌দের 'প্যাক্'-এর একজন হয়ে শিকার করতে শিখল। আর শিখল পশুপাখির ভাষা ও ভাবভঙ্গীর মানে।

কে এসব শেখাল তাকে ?

শেখাল তার দুই বন্ধু—ভালু বলে এক বুড়ো ও বিচক্ষণ ভালুক এবং ভাগিরা নামে এক চতুর চিতাবাঘ। এর চেয়ে বেশি বললে তোমার পড়ার মজাটাই মাটি হয়ে যাবে। বরঞ্চ তারায় গিয়ে পড়ে নিয়ো।





হরদম হুঁশিয়ার

কিছুক্ষণ বাদে বাস গিয়ে থামল একটা বাজারের মধ্যে।

'উছন্না উছন্না' বলে কণ্ডাকটার চেঁচাতে লাগল। উছন্নার যাত্রীরা নেমে যেতেই কণ্ডাকটার হুইসিল বাজিয়ে দিল।

'রোককে, রোককে' বলে এক বুড়ো ভদ্রলোক চেঁচাতে শুরু করলেন।

ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে বলল, জলদি কীজিয়ে সাব, উঠিয়ে।

বুড়ো ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়লেন। তাঁর পেছন পেছন উঠলেন বেশ মোটামতন এক মহিলা ও তাঁর ছোট মেয়ে। বাস স্টার্ট নিল হেঁচকা টানে। ছোট মেয়েটি টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সামনের সিটে হাঁটু লেগে ছড়ে গেল, চিৎকার করে সে কেঁদে উঠল।

বুড়ো দাদু ব্যস্তসমস্ত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কণ্ডাকটার, কণ্ডাকটার রোক্‌কে।

মাফ কিজিয়ে সাব। আগলা স্টপ তক সবুর করনা পড়েগা।

ছোট মেয়েটি আবার কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। ওর মা বললেন, চোট খেয়েছে খুব, রক্ত পড়ছে।

কপিল তার সিট থেকে ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে বলল, দেখি, আমি কিছু করতে পারব বোধ হয়। নবীন, দাও তো আমার হ্যাভারস্যাক্‌টা। ঝোলা থেকে বেরোল পরিপাটি করে সাজানো একটা ফার্স্ট এইড-এর বাক্স। তা থেকে একটি ছোট শিশি বের করে বলল, চোট-লাগা জায়গাটা আগে আমি সাফ করব, মাতাজী। এই বোতলে আছে স্পিরিট, সামান্য একটু জ্বালা করতে পারে। ওকে একটু ধরে বসুন তো, যাতে ছটফট না করে।

একটু তুলো নিয়ে কপিল তার ওপর সামান্য স্পিরিট ঢালল। তারপর ক্ষিপ্র হাতে আঘাতের উপর স্পিরিট বুলিয়ে জায়গাটা পরিস্কার করে ফেলল। মেয়েটি কাঁদো কাঁদো হতেই ওর সামনে তুলে ধরল লাল ওষুধ ভরা আরেকটা শিশি। মেয়েটির দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলল, এবার তুলো দিয়ে তোমার হাঁটুটায় লাল একটা রঙ লাগিয়ে দেব—ঠিক তোমার জামাটার মত লাল। এই বলে ক্ষতটার উপর মার্কু্যরোক্রোম্‌ বুলিয়ে দিল।



বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, খোকা, ডাক্তারি পড়বার মতো তো তোমার বয়স হয়নি। এসব সরঞ্জাম তুমি আনলে কী করে ? কোথায় শিখলে এসব ?

কপিল হেসে বলল, দাদু, আমার বয়স এখন চোদ্দ। কিন্তু আমি স্কাউট, আমাদের কথা হ'ল 'হরদম হুঁশিয়ার'। আমি তাই সবসময় ফার্স্ট এইড্ সরঞ্জাম এবং আরো কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে চলাফেরা করে থাকি।

বৃদ্ধ বললেন, ও তাই বলো, তুমি স্কাউট। বেশ বেশ, খুব ভালো। বহোৎ বহোৎ স্থকরিয়া—

খানিক বাদে বাস থামল। কণ্ডাকটার চেঁচিয়ে বলল, কালকা, কালকা।

বৃদ্ধ-, সেই মোটামতন ভদ্রমহিলা ও ছোট মেয়েটি কালকায় নেমে গেলেন। কণ্ডাকটার বলল যে কালকায় বাস থামবে বিশ মিনিট। প্যাসেঞ্জাররা নেমে একটু ঘোরাফেরা খাওয়াদাওয়া করে আসতে পারেন।

একটা হালুইকরের দোকানের দিকে চলতে চলতে কপিল বলল, চলো নবীন কিছু আলু-পুরী খেয়ে নেওয়া যাক।





তারার ফার্ম

কালকা থেকে বাস যত এগিয়ে যেতে লাগল, চারিদিকের বিচিত্র দৃশ্য দেখে নবীনের চোখে খুশির চমক লাগল। চড়াই পথে রাস্তা চলে গেছে ঘুরে ঘুরে। এক একটা বাঁক আসে আর চোখে পড়ে দিগন্তে দাঁড়িয়ে আছে নূতন নূতন পর্বতমালা। পাহাড়গুলো যেন স্তরে স্তরে উঠে গেছে আকাশের দিকে। আকাশে ঝলমলে সূর্যের আলো, কিন্তু বাতাসে কেমন যেন শীতের আমেজ, থেকে থেকে শরীর শিরশিরিয়ে উঠে। তলদেশের পাহাড়ে ছিল ঝোপঝাড়ের জঙ্গল, উপরের পাহাড়ে উন্নতশীর্ষ ঘন সবুজ গাছ এবং মাঝে মাঝে উজ্জ্বল রঙের ফুলের বাহার।

নবীন বলল, পাশের বনটা কী সুন্দর দেখতে।

ওই যে মাথা-উঁচু গাছগুলো দেখছো ওগুলোকে বলে দেওদার কিংবা দেবদারু। ওর পাতা দেখতে ছুঁচের মতো, কপিল বলল।

আর ওই যে লাল ফুল ? ওগুলো কি গোলাপ ?

কপিল হেসে বলল, না গোলাপ হবে কেন ? ওগুলো রডোডেড্রন ফুল। মে মাসে এইসব বন রডোডেনড্রনে ছেয়ে যায়, দেখে মনে হয় যেন আগুন লেগেছে বনে বনে। এখন তো জুন মাস, তাই সামান্য কিছু ফুল দেখা যাচ্ছে।

নবীন মজা করে বলল, ও, তুমি বুঝি স্কাউট হতে গিয়ে গাছ আর ফুলের সব নাম মুখস্থ করে রেখেছো ?

ঠিক বলেছো, সত্যিই তাই। প্রকৃতি পরিচয় হয়েছে বলে আমি 'নেচার ব্যাজ' পেয়ে গেছি। এই নিয়ে দুই বন্ধুতে বেশ খানিকটা হাসাহাসি হল। কপিল আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই তো তারা দেখা যাচ্ছে। আমরা পৌঁছে গেছি তাহলে। দেখবে ওরা ঠিক বাস স্টেশনে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

কপিলের অনুমান মিথ্যা নয়, বুঝতে পারা গেল বাস যখন থামল। সরু গলায়



কে যেন চেঁচিয়ে বলল, ওইতো-আমি দেখতে পাচ্ছি। কপিল ভাই। দুই বিনুণী ঝুলছে কোমর অবধি, বারো বছরের একটি মেয়ে, চোখে তার খুশির আলো উপচে পড়ছে, বসের দরজা খুলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

আরে রেখা! মাথায় কত লম্বা হয়েছিস তুই।

মেয়েটি হেসে বলল, তোমায় আর ছাড়িয়ে যেতে পারলাম কই? দাওনা ঝুড়িটা আমাকে।

এ হল নবীন। কেবল ওই ঝুড়িটা নয় আরো অনেক কিছু এনেছে কাকিমার জন্য। বিজয় কাকা আসেন নি?

হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন বিজয়কাকা, বললেন, ভাইবোনে মিলে বেশ আড্ডা জমিয়েছে দেখছি। মালপত্তর নামাতে হবেনা? বাসকি তোদের জন্য বসে থাকবে?

চারজনে মিলে সব জিনিস নামিয়ে নিতেই বাস ছুটল সিমলার দিকে।

কাকা কপিলের পিঠ চাপড়ে বললেন, বেশ বড়োসড়ো হয়েছিস তো তুই! মাথায় আমাকেও ছাড়িয়ে যাবি নাকি?



কপিল বন্ধুকে দেখিয়ে বলল, কাকা, এই সেই নবীন।

নবীন একটু লাজুক ভাবে বলল, আপনি আমায় আসতে বলেছেন বলে আমি খুব খুশি।

খুব ভালো হয়েছে এসেছো।

তারপর কপিলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, পরীক্ষাটা দিলি কেমন ?

ওই একরকম পাশ করে যাব নিশ্চয়। নবীন কিন্তু নির্ঘাত ফার্স্ট হবে।

সরু চড়াই পথে ওরা কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, বছর আষ্টেক বয়সের দুটি ছেলেমেয়ে দ্রুত নেমে আসছে ওদের দিকে।

রেখা হেসে বলল, রামু আর রানী। প্রতিদিনের ভালো কাজ করার জন্য এখুনি বায়না ধরবে।

নবীন জিজ্ঞেস করল, ভালো কাজ ? সে আবার কি ?

বিজয়কাকা অবাক হয়ে নবীনের দিকে তাকালেন। ব'ললেন, কেন তুমি কি স্কাউট্ নও ? দৈনিক ভালো কাজ কাকে বলে তুমি জানো না ?

আজ্ঞে না স্যার, এখনো আমি স্কাউট হইনি। হতে ইচ্ছে আছে....। আমতা আমতা করে নবীন জবাব দিল।

রেখা বলল, রামু একজন 'কাব্' আর ওর যমজ বোন রানী 'বুলবুল'। কাব্ ও বুলবলদের সংকল্প নিতে হয় প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ করবে। ওরা তাই সারাক্ষণ খুজে বেড়ায় কাকে কী করে সাহায্য করতে পারে। ওদের বাবা রাও সাহেব তারায় স্টেশন মাস্টার।

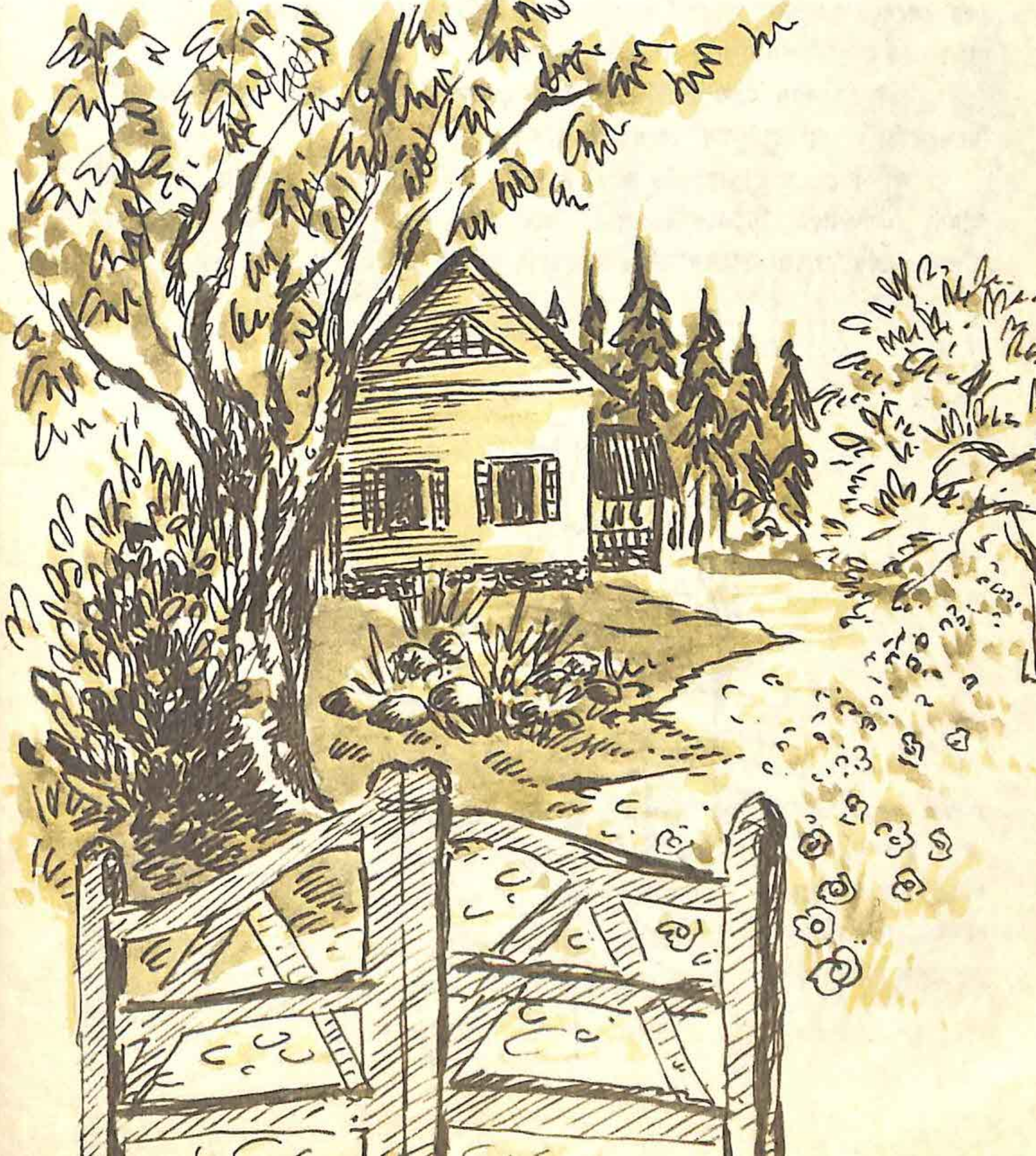
যমজ ভাইবোন ইতিমধ্যে ওদের কাছাকাছি এসে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ওরা বলতে লাগল, বিজয়কাকা, দাওনা একটা মাল। বয়ে নিয়ে যাব। রেখাদিদি, ওই বাক্সটা বরঞ্চ আমাকে দাও আমি ঠিক নিয়ে যেতে পারব।

বিজয়কাকা বললেন, আরে দাঁড়া দেখি একটু। ওসব পরে হবে'খন। সবার আগে 'নমস্তে' বলতে হয় কপিলদাদাকে আর তাঁর এই বন্ধু নবীনকে।

দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রামু ও রানী হাসতে হাসতে বলল, কপিলদাদা, দাওনা কিছু, বয়ে নিয়ে যাব।

বেশ তো। এই হাভারস্যাকটা দু'জনে দুদিক থেকে ধরে নিয়ে চলো দেখি। সাবধান, পড়ে যেন না যায়।

সবাই মিলে আবার চড়াই পথে চলতে লাগল।

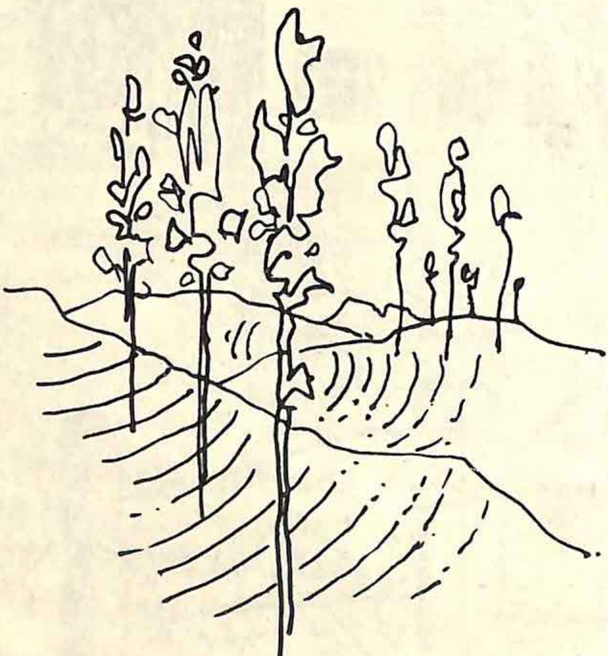


কিছু পরে একটা কাঠের গেট খুলে দিয়ে বিজয়কাকা বললেন, এইযে আমরা পৌঁছে গেছি। তারা ফার্স্ট স্বাগত জানাচ্ছে নবীনকে।

পাথরে বাঁধানো ছোট একটা রাস্তা গিয়ে থেমেছে ছোট একটি বাংলো বাড়ির বারান্দায়। দোতলা থেকে লাল টালির ছাদ নেমে এসেছে, মাথায় একটা চিমনি। গেট থেকে ঢুকে প্রথম নজরেই বাংলো বাড়ীটা নবীনের ভারী ভালো লাগল। বলল, বাঃ। এ যেন ঠিক চিলিতে রূপকথার কুটির।

ওই তেকোনা জানলার উপরে যেখান থেকে টালির ছাদ নামছে—ওইটাই চিলেকোঠা। আমরা দুজন ওই ঘরেই থাকব।

দুদিক থেকে হ্যাভারস্যাক্ ধরে রামু ও রানী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এটা আমরা একেবারে চিলেকোঠা অবধি বয়ে নিয়ে যাব। বেচারাদের দেখে মনে হচ্ছিল ওদের 'ভালো কাজের' বোঝাটা নেহাৎ হালকা নয়।





টুকিটাকি কাজ

যমজ ভাই বোন ধরে বসল, তারা ফার্মের খুঁটিনাটি কুশল ও নবীনকে তারাই দেখাবে। ফার্ম এমন কিছু বড়ো নয় কিন্তু ওরই মধ্যে ছিল লক্ষ্য করে দেখবার মতো বেশ কিছু ব্যাপার। বাংলোর পিছনে তরিতরকারীর বাগান। বাগানের এক পাশে মুরগীর ঘর—কাঠের ফ্রেম-এ জাল লাগিয়ে তৈরী। ভিতরে ডিমে তা দেবার জন্য ছোটো ছোটো বাক্সর মতো ঘর। মেঝেতে বিছানো কাঠের কারখানা থেকে আনা করাতের গুঁড়ো।

রানু আর রাণী বলল, রোজ আমরা ডিম কুড়িয়ে এনে কাকিমার হাতে দিই।

মুরগীর ঘরের দরজাটা খুলতে গিয়ে রেখা বলল, দরজাটা একটু যেন নড়বড়ে হয়ে গেছে। বাবাকে বলেও ছিলাম। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় ভুলে গেছেন নিশ্চয়।

কপিল কবজাগুলো একটু নেড়েচেড়ে বলল, কাকাকে ব্যস্ত করার দরকার নেই। আমিই চট্ করে মেরামত করে দিতে পারব। নূতন দু'টো স্ক্রু দরকার হবে সেসব আমার টুকিটাকি যন্ত্রপাতির পেটিতে নিশ্চয় পেয়ে যাব।

নবীন তো বন্ধুর কথা শুনে মুগ্ধ বলল, কপিল দেখছি সব কাজেই হাত লাগাতে পারে। কাঠের কাজ ও যে কোত্থেকে শিখেছে—সে তো জানা কথা। নিশ্চয় স্কাউট হতে গিয়ে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে শিখেছে।

কাছেই একটা শূন্য গোয়ালঘর দেখিয়ে কপিল জিজ্ঞেস করল, মোষ কোথায় গেল? দেখছি না যে?

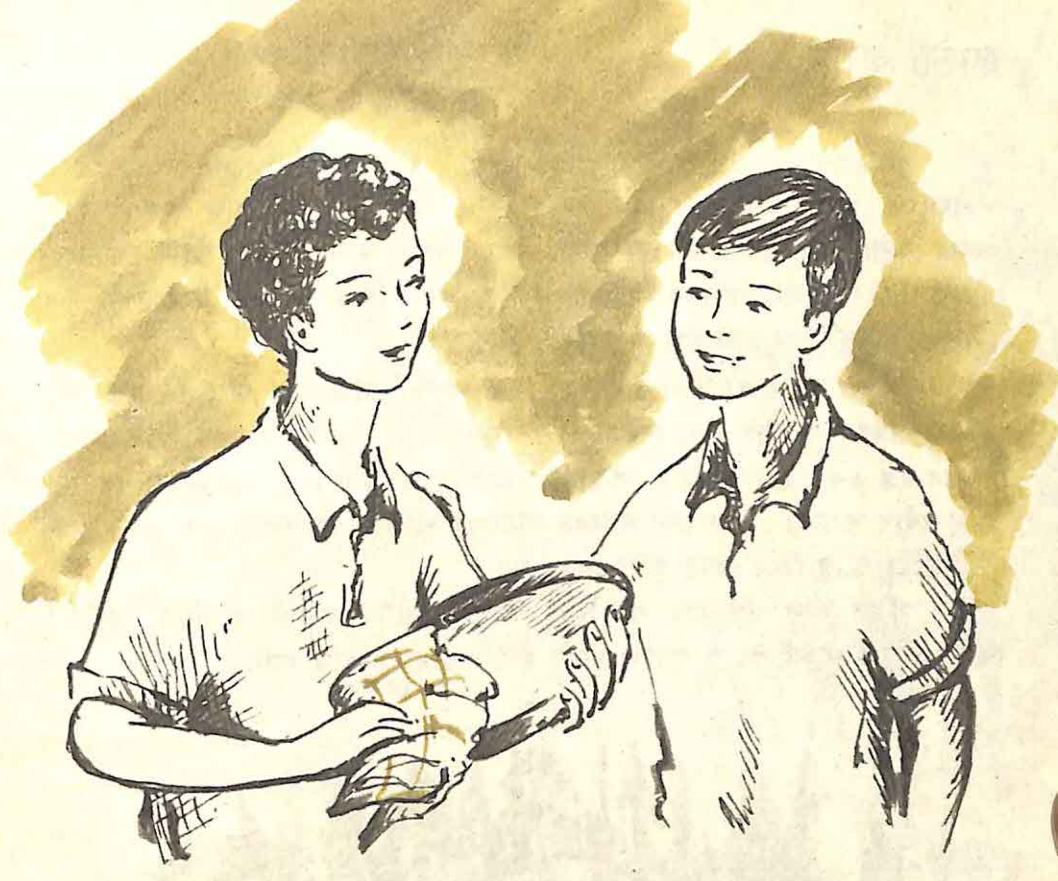
দুঃখের কথা আর বলো না, বলল রেখা, গত বছর শীতের মরশুমে আমাদের মোষটি মারা গেছে। অবশ্য আজকাল আমরা যশোবন্তদের ডেয়ারি থেকে প্রচুর দুধ মাখন পাই।

কপিল বলল, ও তাই নাকি? চমৎকার! যশোবন্তরা এখানো তাহলে এই তল্লাটেই আছে? খুব ভালো স্কাউট। ওকে বললে ও হয়তো দু-একটা রাত আমাদের দুজনাকে ক্যাম্পিং-এ নিয়ে যেতে পারে।

পারে বৈকি! খুব খুশি হয়েই নিয়ে যাবে। কিন্তু সে তো পরের কথা। আপাতত তোমাদের খুব খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। কিছু খেয়ে নেবে চলো। এই বলে রেখা ওদের রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেল।

গনগনে উনুনের পাশেই কাঠের প্যানেল-করা দেয়াল। দেয়ালের গায়ে বেঞ্চির মতো একটি তক্তা লাগানো—সেটাই বসবার জায়গা। তার সামনে নীচু ধরনের খাবার টেবিল।

রেখার মা থালায় থালায় গরম গরম খাবার বেড়ে দিলেন। এক সার লস্যি ভর্তি গ্লাস আগের থেকেই সাজানো ছিল। যে যার থালা গ্লাস নিয়ে খাবার টেবিলে বসে গেল। নবীন বেশ তৃপ্তি করে খেয়েদেয়ে দেখল সবাই একে একে নিজেদের থালা গ্লাস নিয়ে সিংক-এর কাছে চলে গেল। জলের কল খুলে নিজের নিজের বাসন সাফ করল। মায়ের মাজাঘষার জন্য রইল কেবল দুটো ডেকচি। নবীন



বাড়িতে কোনোদিন এঁটো বাসন সাফ করেনি। তাই মনোযোগ দিয়ে দেখল কপিল কি করে না করে। তারপর রেখা এবং বন্ধুর দেখাদেখি সে-ও নিজের থালাটা পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে, উলটো করে সিংক-এর উপরকার তাকে সাজিয়ে রাখল।

মুখ তুলে নবীন দেখল কপিল ওকে লক্ষ্য করছে। হাসিমুখে বলল, 'দু' দিনেই ঠিক শিখে নেব। দেখো তুমি…

সে আর বলতে! নিশ্চয় সব শিখে নেবে। এই বলে বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে কপিল বলল, চলো বাঁধাছাঁদা খুলে আমাদের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখা যাক। তারপর আমরা মুরগীর ঘরের দরজাটা মেরামত করব।

স্কাউট ক্যাম্প

সকালবেলার ভাল খাবার খেতে খেতে বিজয়কাকা বললেন, আজ তো তোমাদের তারা আসার প্রথম দিন। আজ আর কোনো কাজ নয়। চলো আমরা বেড়াতে বেড়াতে স্কাউট ক্যাম্পটা ঘুরে দেখে আসি। বয় স্কাউট কাউকে দেখতে পাবেনা অবশ্য, এ-বছর স্কাউট-শিক্ষকদের জন্য শিবির খোলা হয়েছে। তবু নবীন তো ঘুরে ফিরে এটা ওটা দেখে নিতে পারবে।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছায়াঢাকা সরু একটা রাস্তা চলে গেছে। দুই বন্ধু, রেখা ও বিজয়কাকা সেই রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন। রাস্তা যেখানে শেষ হল—সেখানে মস্ত একটা খোলা মাঠ। পাহাড়ী অঞ্চলে এতখানি প্রকাণ্ড সমতলভূমি দেখতে পেয়ে নবীন অবাক। ঠিক যেন প্যারেড গ্রাউণ্ডের মতো। ময়দানের এক দিকে এক সার কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি কুটির দেখা গেল।

কপিল বলল, গত বছর এইখানেই আমাদের স্কাউট ক্যাম্প বসেছিল, নবীন। চলো, তোমার খাবার ঘর ও শোবার ঘরের ছাউনিগুলো দেখিয়ে আনি।



খাবার ঘরের কেবিন্‌টা বেশ মজার। ছ'জন করে বসতে পারে এইরকম অনেকগুলো টেবিল পাতা। সেই সঙ্গে বসবার জন্য ছ'খানা করে টুল। প্রত্যেক সেট টেবিল-টুলের রঙ একরকম—কোনোটা গাঢ় লাল, গাঢ় সবুজ বা গাঢ় নীল। এই রকম রঙচঙে খাবার ঘরে ঢুকলেই মনটা যেন খুশি হয়ে ওঠে। শোবার কেবিনে সারি সারি বাংক পাতা। থ্রি টায়ার স্লিপিং কোচ-এর মতো। এক একটা কেবিন যেন এক একটা রেলকামরা। এখানেও সেই গাঢ় রঙের বাহার।

নবীন কপিলকে বলল, এই রকম স্কাউট ক্যাম্প-এ একসঙ্গে থাকাটা নিশ্চয় খুব মজার।

ঠিক বলেছো। ক্যাম্প-এ এসে আমার খুব ভালো লেগেছিল। দেশের নানা জায়গা থেকে অনেক স্কাউট এসেছিল। তাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমে গিয়েছিল কয়েক দিনের মধ্যেই।

কেবিনের দরজার কাছে দুটি গোল গোল মুখ উঁকিঝুঁকি মারছে দেখা গেল।

কপিল অবাক, আরে রামু-রাণী যে। কোত্থেকে এলে তোমরা ?

কপিলদাদা, তোমার বন্ধুকে আমরা আমাদের পৌ-ঔ সার্কেল দেখাতে চাই।

বৌ-ঔ সার্কেল, সেটা আবার কি ? নবীন হাসতে হাসতে সুধোল।

ওর কথা শুনে যমজ দু'জন হেসে কুটিপাটি, 'বৌ-ঔ নয়, বৌ-ঔ নয়, পৌ-ঔ।





বিজয়কাকা তখন নবীনকে বুঝিয়ে বললেন, পো-ও সার্কেল হল গোল একটা চক্র। কাবদের প্যাক যখন একত্র হয় ওরা সেই সার্কেলে চক্রাকারে বসে। বেশি দূর হবেনা, সিকি মাইলটাক এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে।

নবীন বলল রামুকে, চলো তাহলে, তোমাদের পৌ-ঔ সার্কেল দেখে আসি।

রামু ও রাণী খুশি হয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নবীনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। স্কাউট ক্যাম্প এর মতো এ-জায়গাটাও পাহাড়ের গা কেটে কেটে সমতলভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। তফাতের মধ্যে এই, স্কাউট ময়দানটা আয়তনে অনেক বড়ো ও চৌকোন মত—এটা অপেক্ষাকৃত ছোট ও গোল ধাঁচের। পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে কেটে সিঁড়ি নেমে গেছে সার্কেল অবধি।

নবীন বলল, ছবিতে দেখেছি গ্রীক্-রোমানরা খোলা আকাশের তলায় থিয়েটর বানাত। অনেকটা যেন সেই রকম।



বিজয়কাকা বললেন, তা নিতান্ত ভুল বলোনি। কাবদের ক্যাম্প উঠে যাবার ঠিক আগের দিন রাত্রে, ওই সার্কেলের মাঝখানে ক্যাম্প-ফায়ার জ্বালিয়ে ছেলেরা নাচ গান খেলাধূলা করে। তখন...

বিজয়কাকার কথা শেষ যতে না হতেই, রামু পরমবিজ্ঞের মতে একটা বড়ো খবর পেশ করল, হ্যাঁ, আর এইখানেই আকেলা সভাপতি হয়ে বসেন।

নবীন জিজ্ঞাসু হয়ে জানতে চাইল, আকেলা ? কে তিনি ?

কপিল কাকাকে বলল, কাকা, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার 'জাংগল বুক' বইটা কি নবীনকে একটু পড়তে দেবে ? তা না হলে তো ও এইভাবে সারাক্ষণ প্রশ্ন করে চলবে।'

নিশ্চয়, পড়তে দেব বৈকি। কাব দলের দলপতিকে বলা হয় আকেলা। কিপলিং-এর বইয়ে নেকড়েদের সর্দারের নাম আকেলা।

পাহাড়ের পিছনে সূর্য ডুবতে লাগল। অস্তগামী সূর্যের আলোয় মেঘের রঙ পালটাতে লাগল—সোনালী থেকে লাল, লাল থেকে বেগুনী—তারপর সব রঙ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। নবীনের মনে হল এমন অপূর্ব দৃশ্য সে আগে কখনো দেখেনি। বলল,

কী চমৎকার ক্যাম্পের এই জায়গাটা।

অনেক বছর আগে পাহাড়ের এই সমস্ত তল্লাটটা ছিল একজন ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অবসর নিয়ে ভারত ছেড়ে যাবার আগে তিনি বয়স্কাউট এসোসিয়েশনকে এই সম্পত্তি দান করে যান। তার কিছুকাল আগেই এদেশের নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ 'হিন্দুস্থান স্কাউট' নাম দিয়ে খাঁটি ভারতীয় ধরণের একটি স্কাউট আন্দোলন শুরু করেন। 1947 সালে ভারত স্বাধীন হবার পর দুটো দল মিলেমিশে এখন হয়েছে 'ভারত স্কাউটস এণ্ড গাইড্স অব ইণ্ডিয়া।' চলো, এবার বাড়ি ফেরা যাক।

পাহাড় অঞ্চলে সন্ধ্যে হতে না হতেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। তারা ফার্মে ফিরে কপিল বলল, নবীন, ওই দেখো সিমলার বিজলীবাতি দেখা যাচ্ছে।

ওদিকের পাহাড়ে তখন যেন দীপাবলীর আলো।

বিজয়কাকা বললেন, এবার আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। নবীনের মনে হল, ঠিক যেন ওর মাথার উপর হাজার হাজার তারা জ্বলছে। নবীন বলল, কত তারা, আর কী উজ্জ্বল। কার্নালে এমনটা দেখা যায়না।

কাকা বললেন, কপিল, নবীনকে ধ্রুব নক্ষত্রটা দেখিয়ে দাও তো, আর বুঝিয়ে দাও কী-ভাবে ওই তারা চিনে নিতে হয়।

এই প্রথম সপ্তর্ষি মণ্ডলের সঙ্গে নবীনের পরিচয় হল। ওই মণ্ডলের দুটো তারা থেকে সোজা সরলরেখা টেনে কীভাবে ধ্রুবতারা খুঁজে পাওয়া যায় বুঝল। কপিল বুঝিয়ে দিল অকূল সমুদ্রে কিংবা অসীম প্রান্তরে কেন মানুষ মাথার উপর আকাশকে দিক নির্ণয়ের যন্ত্র অথবা কম্পাসরূপে কাজে লাগাতে পারে।

সেই রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে গিয়ে নবীন তার বন্ধুকে বলল, এখানে এসে আমার কী যে ভালো লাগছে, কপিল।

তোমার ভালো লাগছে জেনে আমরাও ভালো লাগছে নবীন। এখন চটপট ঘুমিয়ে পড়ো। কাকীমাকে কথা দিয়েছি কাল সকালে উঠে মুরগীর ঘর আমরা দুজনে মিলে পরিস্কার করে দেব।

দায়িত্ব

ঠক ঠক।

নবীনের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ঠক ঠক ঠক।

কপিল, কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে—এই বলে নবীন পাশ ফিরে কপিলের খাটের দিকে তাকাল। কিন্তু কোথায় কপিল? বিছানায় কেউ নেই, কম্বলগুলো সুন্দর করে পাট করা। উপরে টান করে সুজনী বিছানো। নবীন এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কপিলের মতো সুন্দর করে বিছানা পাতল।

কপিল ঘরে ঢুকল, পোশাক বদলে তৈরি হয়ে এসেছে। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, ঘুম ভালো হল তো?

ঠক ঠক ঠক ঠক।

শুনছো কপিল, কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে।

নিশ্চয় সেই কাঠঠোকরাটা। বাংলোর পিছনে ওই সিলভার ওক্ গাছটায় ওর বাসা। ঝট্‌পট্ তৈরি হয়ে নাও—মুরগীর ঘরে যাবার পথে তোমায় দেখিয়ে দেব।

কয়েক মিনিট পরে দুই বন্ধু সেই গাছটার নীচে এসে দাঁড়াল। নবীন জিজ্ঞেস করল, কই, কোথায় সেই কাঠঠোকরা?

চুপ; চুপ। কথা বললেই উড়ে পালাবে।

ঠক ঠক ঠক ঠক।

কপিল আঙুল দিয়ে দেখালে কাঠঠোকরাটোকে। ফিস্‌ফিস করে বলল, ওই যে!

নবীন ভালো করে তাকিয়ে দেখল কাঠঠোকরাটাকে—গায়ের পালকে সাদা-কালো ছিট, মাথার উপর টুকটুকে লাল ঝুঁটি। গাছের গুঁড়ির কাছে লাফিয়ে লাফিয়ে, লম্বা ঠোঁট দিয়ে কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। কপিলকে জিজ্ঞেস করল, কি খাচ্ছে পাখিটা?

গাছের গুঁড়িতে পোকাটোকা আছে কিনা, খুঁটে খুঁটে দেখছে।

গুঁড়ি বেয়ে কেমন হেঁটে হেঁটে উপর দিকে উঠছে। অদ্ভুত পাখিটা তো!

ওর লেজটা দেখছো? যেমন ছোট তেমনি মোটা। ওই লেজের উপর ভর দিয়ে কাঠঠোকরা গাছের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা তো চলবেনা। মুরগীর ঘরের কাজটা পড়ে আছে।

গোয়ালঘর থেকে কপিল একটা ঠেলাগাড়ি আর একটা লম্বা হাতলওয়ালা ঝাড়ু নিয়ে এল। নবীনকে বলল, 'তুমি গাড়িটা ধরো। আমি এই ঝাড়ু দিয়ে করাতের গুঁড়োসুদ্ধু সবটুকু ময়লা জড়ো করব মুরগীর ঘরের দরজার গোড়ায়। ঠেলাগাড়ির মাথাটা যদি সেখানে ঠেকিয়ে রাখো ময়লা গাড়িতে উঠিয়ে নেওয়া যাবে সহজেই। তারপর গাড়ি ঠেলে ময়লা ফেলব বাগানে, ওই সারের গর্তে। তারপর আবার নূতন করে করাতের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেব মুরগীর ঘরের মেঝেতে।

ওদের কাজ চলাকালে কাকীমা এলেন এক ঝুড়ি মুরগীর খাবার নিয়ে।

খাবারটা ঢেলে দিতে দিতে কাকীমা নবীনকে বললেন, খুব ভালো হল, তোমরা কেমন ঝকঝকে করে দিলে। তারপর তি তি করে মুরগীদের ডাক দিলেন।

নিজের নিজের বাক্স থেকে লাফ দিয়ে মুরগীগুলো নেবে, পড়ি কি মরি করতে করতে ছুট দিল খাবারের পাত্র লক্ষ্য করে। কপিল জলের পাত্র থেকে বাসি জল ফেলে ফেলে দিতে লাগল। নবীন জল তুলে এনে আবার সেগুলো ভরিয়ে দিল।

বিজয়কাকা ইতিমধ্যে এসে পড়লেন, বললেন, একটা কাজ করতে পারবে কপিল ?

আলবৎ, কাকা। বলো কি করতে হবে ? হরদম হুঁশিয়ার।

একটা জরুরী কাজে আমায় সিমলা যেতে হচ্ছে। ব্যাসকে জানো তো ? ভেড়ার ব্যবসা করেন। কথা দিয়েছিলাম আজ তার ওখানে এক সপ্তাহের তরিতর-





কারী পৌঁছিয়ে দেব। তোমরা দুজনে যদি একাজ করতে পারো খুব ভালো হয়।

খুব খুশি হয়ে করব, কাকা। আমার খুব ইচ্ছে নবীনকে নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরার। নবীনের দিকে ফিরে কপিল বলল, 'ব্যাস সাহেব যেখানে থাকেন সেটা স্কাউট ক্যাম্প থেকে মাইল দুই দূরে—উৎরাই পথে।

বাংলো ছেড়ে বেরোবার মুখে কপিল টিফিন বাক্সে কিছু খাবার ও ফ্লাস্কে দুজনের মতো গরম দুধ নিয়ে হ্যাভারস্যাক -এ রাখল। নবীন লক্ষ্য করল, এসব ছাড়া কপিল একটা ছুরি নিল এবং একটা নোটবুক। অতঃপর দুই বন্ধু দুই থলে ভরতি করে শাক সবজী নিল ব্যাস-সাহেবের জন্য।

ব্যাস সাহেবের ওখানে পোঁছুতে লাগল ঝাড়া দুই ঘন্টা।

কপিল রোগাপানা এক ভদ্রলোকের দিকে হাত নাড়িয়ে নবীনকে বলল, উনিই ব্যাস সাহেব। ব্যাস তখন একটি আহত ভেড়া নিয়ে সেবায় ব্যস্ত।

কপিল তাঁকে জানাল, কাকা আপনার জন্য এইসব শাকসবজি পাঠিয়েছেন ব্যাস-সাহেব।

বেশ বেশ। খুব খুশি হলাম। ভাঁড়ারঘরে যদি রেখে দিতে পারো আরো খুশি হব। দেখছো তো, এই ভেড়াটাকে নিয়ে ভারি ব্যস্ত আছি। ওর পা ভেঙেছে।

শাকসবজির থলে দুটো ভাঁড়ারে রেখে এসে কপিল ব্যাসসাহেবকে বলল, আপনি তো খুব ব্যস্ত আছেন। আমরা তা হলে ফিরে চললাম। নমস্তে—।

লুকোচুরি

চড়াই উৎরাই পথে হাঁটতে গিয়ে দুই বন্ধুর পরিশ্রম হয়েছিল খুব, খিদেও পেয়েছিল প্রচুর। কপিল রাস্তা থেকে কিছু দূরে সুন্দর একটি জায়গা বেছে নিয়ে টিফিন বাক্স ও ফ্লাস্ক বের করল। কাকীমা ঠেসে দিয়েছেন পরোটা, আলুর দম ও সেদ্ধ ডিম। ফ্লাস্কটাতে ছিল দুজনের মতো গরম দুধ। খাওয়া শেষ করে কপিল প্রস্তাব করল, স্কাউটদের মতো ওরা দুজনে 'শিকারী-শিকার' খেলাটা খেলবে।

নবীন বলল, কি করে খেলতে হয় আমি তো জানিনা।

আমি পিছন ফিরে থাকব, তাকাবো না তোমার দিকে। তুমি চলে যাও জঙ্গলে। তোমায় পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হল, তার মধ্যে তুমি পছন্দ মতো জায়গা বেছে নিয়ে লুকিয়ে থাকবে। তখন আমার কাজ হবে তোমার পথ-চলার চিহ্ন দেখে দেখে তোমায় খুঁজে বের করা।

নবীন বলল, চিহ্ন আমি রাখলে তো। এমন ভাবে যাব, কোনো চিহ্ন থাকবে না।

অন্যদের মতো তুমিও নিশ্চয়ই ভেবেছো কোনো চিহ্ন না রেখে তুমি লুকিয়ে পড়তে পারবে, কপিল বলল বন্ধুকে। কিন্তু স্কাউটদের শিক্ষা দেওয়া হয় কীভাবে রহস্য সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করতে হয়। চলাফেরা গতিবিধির চিহ্ন কিছু থাকেই। বেশ তো তোমায় যদি খুঁজে পাই তো বলব কী করে খুঁজে পেলাম।

নবীন এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাস্তা চলতে গিয়েও দেখেছিল পাহাড়ের পারের দিকে বড় বড় সব পাথর গাদাগাদি করে পড়ে আছে। কোনো কোনো জায়গায় ওইসব পাথরের কাছেই বেশ ঘন ঝোপঝাড়। লুকিয়ে থাকবার জন্য চমৎকার জায়গা। নবীন পথের পাশের ঝোপঝাড় একটু ফাঁক করে, দুটো পাথরের মাঝখানের ফোকরে গুড়ি মেরে লুকিয়ে রইল।



এতক্ষণে কপিল শিকারের নেশায় অধীর হয়ে উঠেছে। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে ও নবীনের পিছু ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ল। খানিক পরে নবীন আশ্চর্য হয়ে

দেখল তার মাথার উপর থেকে কে যেন উঁকি মেরে দেখছে। কে আবার? কপিল স্বয়ং। বলল, ধরা পড়ে গেছ, নবীন।

এমন চট করে ধরা পড়বে নবীন ভাবেনি। ওর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে আমায় খুঁজে পেলে, কপিল?

এসো তাহলে দেখিয়ে দি কেমন করে তোমায় ধরলাম। যেতে যেতে তুমিই তোমার গতিবিধির ইশারা রেখে গিয়েছিল। প্রথমত, চলতে চলতে তুমি একবার কাশি চেপেছিলে, মনে আছে? সেই শব্দ থেকে আন্দাজ পেলাম মোটামুটি কোন দিকে তুমি লুকোবার জন্য গেলে। শব্দটা এসেছিল রাস্তার এই বাঁক থেকে। তারপর এই দেখো, রাস্তা ও ঝোপের মাঝখানে একটু যে ভিজে মাটি—তার উপর তোমার জুতোর স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। তারপর এই ঝোপঝাড় নজর করে দেখো, দেখেই বুঝতে পারা যায় সদ্য কেউ ডালপালা সরিয়ে একটু ফাঁক করে নিয়েছে।

নবীন বলল, হ্যাঁ, এখন তোমার বলার ফলে বুঝতে পারছি, ধরা পড়বার মতো চিহ্ন বা ইশারা রাখতে আমি কসুর করিনি। এবার তো তোমার পালা। চোর হয়ে তো হেরে গেলাম, দেখা যাক এখন গোয়েন্দা হয়ে জিততে পারি কিনা।

নবীন পিছন ফিরে চুপটি করে বসে রইল—কান দুটো খাড়া রাখল যাতে টু শব্দটা ওকে না এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু কপিল কোন পথে যে গেল কোনো আওয়াজ আন্দাজ পাওয়া গেলনা। কানে এল শুধু দেবদারুর মর্মর আর দাঁড়কাকের কা কা। পাঁচ মিনিট উতরে গেছে মনে করে নবীন তো বেরোল, কিন্তু কোন পথে কপিল যে গেছে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ওর নজরে পড়লনা। কেমন যেন ওর ধারণা হল ও নিজে যে-পথে গিয়েছিল, কপিল নিশ্চয় তার উলটো পথ ধরে থাকবে। সেই পথে নবীন এগিয়ে গেল, কিন্তু ঝোপঝাড় সরানো নড়ানোর চিহ্ন কিংবা জুতোর ছাপ তার নজরে পড়লনা।

হঠাৎ ওর পাশের ঝোপটা কেমন যেন নড়ে উঠল। সাপ নয়তো! ভয়ে ওর শরীর হিম। তারপর শোনা গেল কুঁই কুঁই কান্নার শব্দ।

পর মুহূর্তে লুকোচুরি খেলার সব কথা ভুলে গিয়ে গলা ছেড়ে ডাকতে লাগল, কপিল, কপি—ল!

নবীনের আর্ত চীৎকারে কপিলও ভয় পেল। লুকোবার জায়গা থেকে ও ধড়মড়িয়ে বেরিয়ে এল। আসলে ও লুকিয়েছিল নবীনের জায়গা থেকে বিশ হাত মতো দূরে একটা শিশু দেবদারু ঝোপে। নবীনের চীৎকার অনুসরন করে ছুটে যেতে যেতে ও ভাবতে লাগল শহুরে আনাড়ীর কোনো বিপদ ঘটেনি তো!

ছুটতে ছুটতে এসে দেখল, নবীন দুটো পাথরের মাঝখানে উবুড় হয়ে শুয়ে তলা-

কার ঝোপঝাড়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে কপিল জিজ্ঞেস করল, নবীন, কোনো চোট লাগেনি তো?

কপিল এদিকে এসে একবার লক্ষ্য করে দেখো তো। ওখানে হাত দিতে আমার কেমন যেন লাগছে। শুনতে পাচ্ছ কান্না?

কপিলও শুনতে পেল কুঁই কুঁই শব্দ। নবীনের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ও লক্ষ্য করে দেখল ছোট্ট একটি কুকুরছানা ভয়ে, যন্ত্রণায় ও অনাহারে মৃতপ্রায় পড়ে আছে, ঝোপের নীচে একটা ছোট গর্তে ওর সামনের একটা পা একটা ফাঁদে আটকে আছে।

হায় হায়—বেচারা। নবীন, একটু সরে যাও-দেখি, ফাঁদসুদ্ধ ছানাটাকে উঠিয়ে আনা যায় কিনা। এই ধরনের ফাঁদ আমি বহু দেখেছি। যারা পরের জমিতে চুরি করে শিকার করে তারাই এইসব ফাঁদ পাতে খরগোস ধরবার জন্য।

খাঁচাটাতে হাত লাগাতেই কুকুরছানাটা আবার একবার কেঁউ কেঁউ করে উঠল। দুই বন্ধু মিলে গর্ত থেকে খাঁচাসুদ্ধ বাচ্চাটাকে তুলে নিল। কপিল ফাঁদের জাঁতাকল খুলে পা-টাকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখল পায়ের সামনের দিকটা ঝুঁকে পড়েছে।

কপিল বলল এই পাটা নিশ্চয় ভেঙ্গে গিয়ে থাকবে। কিন্তু বাচ্চা তো, ভালো করে বেঁধে দিলে হাড় জোড়া লেগে যাবে হয়তো। খাঁচায় কবে যে পা দিয়েছে কে জানে। দেখে মনে হচ্ছে বেশ ক'দিন কিছু খেতে পায়নি, কেমন রোগা হয়ে গেছে দেখছো তো...

খাঁচাটাকে পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নবীন বলল, মানুষ কী নিষ্ঠুর হতে পারে।

ওটা ফেলে দিও না, নবীন। পুলিশে খবর দিতে হবে। ওটা তুমি নিয়ে এসো, আমি ছানাটিকে নিয়ে এগোচ্ছি।



ছোট ভালু

দুই বন্ধু বারান্দার পা দিয়েছে এমন সময় বিজয়কাকা গেট খুলে ঢুকলেন।

তোমাদের হাতে ওসব কি ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

কপিল ও নবীন তাঁকে তখন সব কথা বলল। নবীনের হাত থেকে খাঁচাটা নিয়ে তিনি বললেন, যে-ই করে থাকুক, এ খুবই জঘন্য কাজ। আমি এটা নিয়ে থানায় গিয়ে রিপোর্ট করব। কপিল, কাকিমার কাছে নিয়ে যাও, তিনি কুকুরছানার পা-টা ভালো করে ব্যাণ্ডেজ করে দেবেন।

কাকিমা যখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে ব্যস্ত, রেখা ঢুকল ঘরে। নবীনের কাছে সব কথা শুনে কুকুরছানার প্রতি ওর খুব মায়া হল, বলল, ওটাকে রেখে আমরা পুষব, মা ? ভালু মরে যাবার পর বাড়ীতে আমাদের কুকুর নেই। দেখেছো ওর গায়ের রঙ ঠিক ভালুর মতো-বাদামী, আর নাকটাও কালো। ওকে আমরা নাম দেব ছোট ভালু।

দাঁড়াও দেখি, আগে বাঁচুক, পরে পোষ মানাবার কথা বোলো। বেচারার ক'দিন থেকে পেটে কিছু পড়েনি। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে।

রেখা ব্যগ্র হয়ে বলল, আমি ওর দেখাশোনা করব। দাঁড়াও, ওর জন্যে একটা নরম বিছানা করে আনি। নবীনদা এসো, আমায় একটু সাহায্য করবে।

বাগান করবার যন্ত্রপাতি থাকে যে-ঘরটায়, নবীনকে নিয়ে রেখা গেল সেখানে। একটা গোল মতন খালি ঝুড়ি পাওয়া গেল। নবীন সেটাকে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে আনলে পর, রেখা প্রথমে কয়েক পরত খড় বিছিয়ে দিয়ে তার উপর কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাপড় ভাঁজ করে বিছানা তৈরী করল। ছানাটাকে ব্যাণ্ডেজ করে শুইয়ে দেওয়া হল ঝুড়িতে।

ইতিমধ্যে রাম ও রাণী এসে হাজির। রাণীর হাতে মস্ত একটি বাদামী কাগজের খাতা। বলল, কপিলদা, আমার জংলী ফুলের সংগ্রহ দেখতে চাও তো এসো।

কপিল জবাবে বলল, আগে একবার দেখো তো আমরা কি সংগ্রহ করে এনেছি। এই বলে কুকুর ছানার দিকে আঙুল দেখাল।

কাকীমা বললেন, জানিনা কি করে ছানাটাকে একটু দুধ খাওয়ানো যায়। বাটি থেকে কিংবা টিন থেকে যে খাবে গায়ে ওর তেমন শক্তি নেই। ঘরে একটা ফীডিং

বোতল থাকলে এখন কাজে দিত। রাণী জিজ্ঞেস করল আমার বড় পুতুলটার ফীডিং বোতল এনে দেব কি ?

কপিল বলল, সে তো-খুব-ভালো কথা। ওতেই কাজ চলবে। কপিলের কথা শুনে ভাইবোনে মিলে ছুটে চলে গেল ওদের বাড়ি থেকে ডল পুতুলের ফীডিং বোতল আনতে। দেখা গেল, বোতলটা বাচচাটার উপযুক্ত। বোতলের চুষি থেকে কিভাবে দুধ টানতে হয়—রেখা ওর ছোট ভালুকে তা একটু একটু করে শিখিয়ে দিল।

কপিল বন্ধুকে বলল, নবীন, স্কাউট হবার পরীক্ষা আজ তুমি ভালো করে পাশ করেছো, সে তুমি হয়তো খেয়াল করোনি।

নবীন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তার মানে ?

কপিল ওর স্কাউট সম্পর্কিত বই থেকে একটা লাইন শুনিয়ে দিল, স্কাউট মাত্রই সকল প্রানীর বন্ধু।

ইতিমধ্যে ব্যাথার অনেকটা আরাম হবার ফলে এবং পেট ভরে দুধ খেয়ে, ছোট ভালু তার বিছানায় কুণ্ডলী পাকিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।



সংকট সংকেত

সেদিনকার ঘটনায় নবীনের মন বিচলিত ছিল বলে, রাতে কিছুতেই ওর চোখে ঘুম আসছিলনা। 'জাংগল বুক' বইটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে বসে পড়ল। ইতিমধ্যে কপিল ঘুমিয়ে পড়াতে বই পড়া বন্ধ করতে হল, আলো নিবিয়ে দিতে হল। ও তখন চিলেকোঠার সেই তেকোনা জানালাটার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল, কপিল যেসব তারার নাম বলে দিয়েছিল সেগুলো চিনতে পারে কিনা পরখ করতে লাগল।

দূরে একটা শেয়ালের ডাক শোনা গেল। নিশুত রাত, সেই নিঃশব্দ অন্ধকারের বুক চিরে হুক্কাহুয়া ডাকটার ঢেউ গিয়ে লাগল দূর পাহাড়তলীতে। স্কাউট ক্যাম্পের তলায় একটা ঝোপঝাড় থেকে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উঠছে দেখে নবীন কিছুক্ষণ সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

একি! কতকগুলো আগুনের ফলকি হঠাৎ উপর দিকে উঠে ঝরে পড়ল যেন তারার মতো! যেখান থেকে ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল সে-জায়গা থেকে কিছুটা দূরে আরেকটা ঝোপ হঠাৎ যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল! আবার শোনা গেল শেয়ালের ডাক, দীর্ঘায়িত কান্নার মতো।



নবীনের গা কেমন যেন ছমছম করে উঠল। পাহাড়ে জঙ্গলে খাণ্ডবদহনের মতো যে দাবানলের কথা সেদিন কপিল বলছিল—এ সে তাণ্ডবের সূচনা নয় তো? কপিলকে কি জাগাবে? না কি সমস্তই ওর মিছে আশংকা?

কিন্তু চুপ করে থাকে কেমন করে? আগুনটা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে যে! অগত্যা কপিলের কাঁধে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে নবীন ডাকল, কপিল, কপিল! উঠে পড়ো—দেখো তো এসে জানালার ধারে....

ঘুম ঘুম স্বরে কপিল জিজ্ঞেস করল, কী হল আবার....?

নবীন বলল, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা। মনে হচ্ছে যেন দাবানল।

বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে, কপিল জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। তাই তো মনে হচ্ছে! গরম কাপড়-চোপড় কিছু পরে নাও। টর্চটা কোথায়? তাড়াতাড়ি নেমে এসো। আমি গিয়ে কাকাকে জাগাচ্ছি। কথা বলতে বলতে কপিল পুলওভারটা গলার উপর দিয়ে গলিয়ে দিল, টর্চ তুলে নিল আলমায়ীরর মাথা থেকে, মোজা জুতো পরে তরতর করে নেমে গেল একতলায়।

নবীন নীচে এসে দেখে বিজয়কাকাও তৈরী। তিনি বললেন, চলে এসো আমার পিছন পিছন।

বাংলো থেকে বেরোবার সময় দূরে ওই মহল্লার ঘন্টায় বিপদ সংকেত ধ্বনি শোনা গেল ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। রাতের অন্ধকারে পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে এল, ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। সে আওয়াজের যেন বিরাম নেই।

পথে কিছুটা এগিয়ে যেতেই মহল্লার অনেকে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চলতে লাগল স্কাউট ক্যাম্পের দিকে।

দুর্ঘটনার জায়গাটাতে পৌঁছুতে দেখা গেল দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ওদের আগেই যারা জড়ো হয়েছে তারা ইতিমধ্যে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। নবীন দেখল হাত থেকে হাতে জলের বালতি দ্রুত চলাচল করছে। সাদা চুলের বৃদ্ধ ভদ্রলোক আগুন নেবানোর কাজ তদারকি করছেন। জল দেবার নল এতটা লম্বা নয় যে স্কাউট ক্যাম্প থেকে ঘটনাস্থল অবধি জল নেবার ব্যবস্থা করা যায়। সেইজন্য হাতে হাতে বালতি পাঠানোর ব্যবস্থা। বিজয়কাকা, কপিল, নবীনও দাঁড়িয়ে গেল বালতির লাইনে।

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, যশোবন্ত, পালটা আগুন না জ্বালালে আগুন নেবানো যাবেনা, ভলান্টিয়র জোগাড় করো।

চড়া গলায় জবাব এল, এই যে, যাচ্ছি স্যর।

নবীন দেখল দীর্ঘদেহ একটি শিখ ছেলে লাইন থেকে বেরিয়ে ছুটে চলে গেল পাহাড়ের উপর দিকে, তাঁর পিছনে আরো দু-তিন জন। আশ্চর্যের ব্যাপার আগুন নেবাবার কোনো উদযোগ না করে, ওরা কাছাকাছি একসারি ঝোপঝাড়ে আগুন লাগিয়ে দিল। নবীন কপিলকে জিজ্ঞেস করল, কী করছে ওরা?

দেবদারু-সারের নীচে এদিককার আগুন মিলবে ওদিককার আগুনের সঙ্গে। আগুন দিয়ে আগুন নেবানো যায়। ওই দলের নেতা যশোবন্ত আমার বন্ধু।

জল ছিটিয়ে এদিককার অনেকগুলি ঝোপের আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়ে গেল। এবার ঝোপের সারি ধরে কিছু কিছু লোক লাঠি হাতে শিকড়ের দিকে বাড়ি মারতে

লাগল, যাতে একটাও জলন্ত স্ফুলিঙ্গ না থাকে। তার পর জুতো যাদের পায়ে ছিল তারা নিভন্ত ছাইয়ের উপর কদম কদম পা ফেলে ফেলে চলে গেল। তার পরে আগুনের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত নিভিয়ে ফেলা হল।

এবার উপরকার ঝোপের আগুন মিলল নীচের আগুনের সঙ্গে। লকলকিয়ে—একবার শিষ উঠল লম্বা হয়ে, ব্যস তার পরেই সব আগুন ছাই হয়ে গেল। নবীন ব্যাপার দেখে অবাক।

যশোবন্ত হাঁক দিল—ছাইয়ের গাদার উপর বালি ছিটোবার জন্য আরো কিছু লোকের দরকার।

কপিল নবীনের হাত ধরে বলল, চলো, যশোবন্তের কাজে সাহায্য করি—।. বালি ফেলার কাজটা ওদের বেশ পছন্দ হল।

যশোবন্ত কপিলকে দেখে বলল, এই যে কপিল! শুনেছিলাম তুমি এসেছো। শেষ পর্যন্ত দেখা হল কিনা আগুন নেভাতে গিয়ে। কিন্তু এখন তো গল্প করা যাবেন। তোমরা দুজন বরঞ্চ বালতিতে বালি ভরে দাও, অন্যেরা বয়ে নিয়ে আসবে লাইন ধরে—।

ময়দানটার এক প্রান্তে ছিল প্রকাণ্ড একটা গর্ত, যার মাথা পর্যন্ত বালিতে ভরা। স্পোর্টস-এর সময় ওই বালি লাফ-ঝাঁপ দেবার জায়গায় বিছিয়ে দেওয়া হয়। দুই বন্ধুতে কোদালে বালি তুলে ঝটপট থলেতে ভরে দিতে লাগল। এমন সময় বিজয়কাকা এসে বললেন, আমাদের যতটুকু করবার, করা হয়ে গেছে। এখন আমাদের ছুটি। সিমলা থেকে দমকল এসে গেছে, বাকি কাজ তারা করবে। যশোবন্ত, তুমিও চলে এসো আমাদের ওখানে। ফার্ম-এ এক মগ গরম চা খেয়ে বাড়ি ফিরে যেয়ো'খন।

অত্যধিক পরিশ্রমে ওরা সবাই ক্লান্ত। কিন্তু আগুন নেভানোর কাজটা ভালো করে করা গেছে বলে সবাই বেশ খুশি। ফার্মে গিয়ে-ওরা বেশ তৃপ্তি করে কাকিমার তৈরী গরম গরম চা মস্ত মস্ত মগে খেল। চা খেতে খেতে কপিল যশোবন্তকে বলল, আমি তো ঠিক করে বসে আছি তুমি একবার আমার বন্ধু ও আমাকে নিয়ে যাবে সেই রাখালদের কুটিরে। দুটো রাত সেখানেই আমরা ক্যাম্পিং করব।

যশোবন্ত জবাবে বলল, আমারও তো যেতে খুব ইচ্ছা। তবে এই শনি-রবিবারের আগে বেরোতে পারবনা। কাল আমাদের স্কাউট দল যাচ্ছে চাঁদপুরের পশুমেলায়। সেখানে অনেক কাজ আছে। অথচ ওদের স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা খুবই কম। তুমি আমাদের স্কাউট দলের সঙ্গে যাবে নাকি ?

সেখানেই কথাবার্তা বলে ঠিক হল, স্কাউট স্বেচ্ছাসেবী দলভুক্ত হয়ে পরের দিন সকালে যশোবন্তের সঙ্গে কপিলও যাবে চাঁদপুরের পশুমেলায়।

চাঁদপুরের মেলা

তারা থেকে উৎরাই পথে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ব্যবধানে কালকা মেন রোড থেকে ভিন্নমুখী একটা রাস্তার ধারে চাঁদপুর গ্রাম। প্রতি বছর এই গ্রামে তিনদিনব্যাপী একটা মেলা বসে। গ্রামের প্রান্তে একটি কুণ্ড, তারই পাশে একটি ছোট টিলার উপর ছোট একটি মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন চণ্ডী। আশেপাশের পাহাড়ী পাড়াগাঁ থেকে লোকজন মেলার সময় আসে দেবীর পূজো দিতে এবং গৃহপালিত পশু বেচাকেনা করতে।

আগুন লাগার পরের দিন সকালবেলা যশোবন্ত ও কপিল সিমলার স্কাউট দলের সঙ্গে একটা বাসে রওনা হয়ে গেল চাঁদপুরের দিকে।

চাঁদপুরে বাস যখন পৌঁছল মন্দিরের নীচেকার ময়দানে তখন মেলা বেশ জমে উঠেছে। চারিদিকে লোকজনের ও গৃহপালিত পশুর ভিড়। স্কাউটদের সবাইকে বলে দেওয়া হল কাকে কি করতে হবে। যশোবন্তের দলকে বলা হল ময়দানের একটা জায়গায় বেড়া দিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন পশুদের জন্য আলাদা আলাদা খোঁয়াড় তৈরি করতে। শিশুদের টিকা দেবার জন্য এবং মেলায় আগত লোকেদের অসুস্থতায় চিকিৎসা করার জন্য, একটা মেডিকেল ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে একজন ডাক্তারকে বসানো হয়েছে। কপিলকে মোতায়েন করা হল সেই ঘাঁটিতে। টিকা দিতে ছোটদের যতটা না ভয় তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় তাদের মায়েদের। কপিল ঘাঁটিতে বসে মায়েদের বুঝিয়ে দিতে লাগল ডাক্তার শিশুদের টিকা দিচ্ছেন বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করতে, শিশুদের কষ্ট দেবার জন্য নয়।

বুড়োবুড়ী অনেক এসেছে মেলায়। বেশির ভাগ তীর্থযাত্রী। বেচাকেনা করতে আসেনি, এসেছে চণ্ডীদেবীর মন্দিরে পুজো দিতে। মেডিকেল ঘাঁটির কাজ শেষ করে কপিল যখন স্কাউট ক্যাম্পে ফিরছে, দেখল একজন থুত্থুরে বুড়ী টিলার গায়ে কাটা উঁচু উঁচু ধাপ বেয়ে উঠছে মন্দিরে যাবার জন্য। সারাদিন খাটুনীর পর কপিল তখন খুবই ক্লান্ত; ভাবছে ক্যাম্পে গিয়ে এক মগ গরম চা পান করে একটু গা এলিয়ে দেবে। কিন্তু বৃদ্ধার হাবভাব দেখে বুঝতে পারল, কেউ যদি এগিয়ে এসে তার হাত না ধরে তা হলে তার মন্দির দর্শন হবেনা।

কপিল এগিয়ে গিয়ে বলল, বুড়ী মা, আমার হাত ধরে চলুন।

বৃদ্ধা কপিলের হাতটা জড়িয়ে ধরে বললেন, বাঁচালে বাবা। বেঁচে থাকো তুমি।

মন্দিরের দরজা অবধি বৃদ্ধাকে পৌঁছে দিয়ে কপিল লক্ষ্য করল, পুণ্যার্থী বেশ কিছু লোক কুণ্ডে নেমেছে স্নান করতে। স্নানের ঘাটে ডিউটি পড়েছে স্কাউট দলের হরির উপর। কপিল দেখল, এক বৃদ্ধ তীর্থযাত্রীকে হরি সাহায্য করছে কুণ্ডের জল থেকে সিঁড়িতে উঠতে। এমন সময় হঠাৎ একটা রব শোনা গেল, হায় হায়, ডুবে গেল ডুবে গেল।' কুণ্ডের ধারে যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে কেমন করে জানি জলে পড়ে গেছে।

কালবিলম্ব না করে হরি ডুব দিল কুণ্ডে। ছেলেটি একবার ভেসে উঠেছিল কিন্তু আবার ডুবে যাচ্ছে। হরি ডুব সাঁতার দিয়ে চলে গেল ছেলেটির তলায় তারপর চিৎ-সাঁতার দিতে দিতে, ছেলেটির বগল শক্ত করে ধরে ভেসে উঠল উপরে। হরি সিঁড়ির কাছে আসতেই কপিল হাঁটু গেড়ে ছেলেটিকে টেনে তুলল। তারপর ঘাটের



উপর তাকে শুইয়ে দিল উবুড় করে। তারপর ওর শরীরের দু-পাশে হাঁটু গেড়ে, পিঠের দিকের পাঁজরার উপর দু-হাতে চেপে চেপে ম্যাসাজ করতে লাগল—ঠিক যেমনটি শিখেছিল 'জীবন-রক্ষা' পরীক্ষা পাশ করার আগে।

আপাদমস্তক চুবড়ি হয়ে ভিজে হরি উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছে ?

কপিল বলল, এখুনি ঠিক হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, জল বেশি খায়নি। ছেলেটি হাঁ করে একবার নিশ্বাস নিতেই কস দিয়ে কিছুটা জল গড়িয়ে পড়ল। বমির সঙ্গেও কিছু জল বেরোল। তারপর কাঁদতে লাগল। কপিল হরিকে বলল, ভিজে কাপড়ে থেকোনা। ক্যাম্পে গিয়ে কাপড় বদলে নাও।

চারিদিকে ভিড় জমে গেছে। কারো মনে উদ্বেগ, কারো বা উত্তেজনা। কেউ এসেছে নিছক ঔৎসুক্য নিয়ে। হরি তাদের সবাইকে সরে যেতে বলল, ভিড় করবেননা, হাওয়া বন্ধ করবেন না, ছেলেটাকে দম নিতে দিন। ক্যাম্প-এ যাবার মুখে কপিলকে বলে গেল, যাবার পথে আমি ডাক্তারবাবুকে বলে যাচ্ছি।

ছেলেটি ইতিমধ্যে অনেকটা সেরে উঠেছে। কপিল লোকজনকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, এটি কার ছেলে ?

আঠারো-উনিশ বছরের একটি তরুণ রাখাল এগিয়ে এসে বলল, ও আমার ভাই, হুজুর।

কপিল গম্ভীর গলায় বলল, তা হলে ওর উপর নজর রাখা উচিত ছিল তোমার।

এক মগ গরম দুধ ও একটা কম্বল নিয়ে ডাক্তার এসে পড়লেন, বললেন, তোমরা দুজন স্কাউট মিলে বেড়ে কাজ করেছো ! আর কোনো ভাবনা নেই—এবার ঠিক হয়ে যাবে।

কপিল তার তাঁবুতে ফিরতে গিয়ে দেখে যশোবন্ত ওর জন্য অপেক্ষা করছে। কপিল জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করছিলে যশোবন্ত ?

আর বলো কেন। কুমার আর আমি আজ যা করেছি তাকে সত্যিই বলে 'গোরুখোঁজা'। একটা হারানো বাছুর খুঁজতে গিয়ে সে কী হয়রানি। আমরা খুঁজে মরছি বাছুরটাকে, মাঝখান থেকে একটা শিংওয়ালা ষাঁড় করল আমাদের তাড়া... এইবলে যশোবন্ত খুব হাসতে লাগল।

কপিল বলল, সেই যখন কার্নালে আন্ত-রাজ্য স্পোর্টস হ'ল, তখন স্কাউট

হিসাবে আমাদের যে-সব ডিউটি দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে আজকের ডিউটির আকাশ-পাতাল তফাৎ। বুড়োবুড়ীদের রাস্তা পার করে দেওয়া কোন বাস কোথায় যায় বলে দেওয়া, গেটে দাঁড়িয়ে টিকিট চেক করা কিংবা দর্শকদের নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দেওয়া—ব্যস,স্রেফ এই ছিল আমাদের কাজ।

যশোবন্ত বলল, ঠিক বলেছো। শহরের সমস্যার সঙ্গে গ্রামের সমস্যায় আকাশ পাতাল তফাতই বটে। কিন্তু গাঁয়ের লোকদের খুব ভালো লাগে আমার—এরা বেশ বন্ধু ভাবাপন্ন। খেতে খামারে কত খাটে, কিন্তু কেমন হাসিখুশি। ওই শোনো, কোথায় কারা যেন গান ধরেছে।

ময়দানের অপর পার থেকে একটি পাহাড়ী গানের রেশ ভেসে এল। এদিকে ওদিকে কাঠকুটো জোগাড় করে ওরা উনুন ধরাল রাতের খাবার রান্না করতে।

কপিল বলল, নবীন থাকলে বেশ হত।



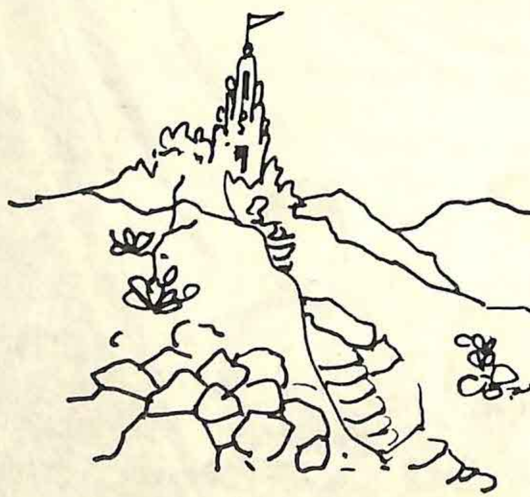
ওর জন্য ভেবোনা তুমি। ওকে আমরা শনি-রোববারে নিশ্চয় নিয়ে যাব রাখালদের পাড়ায়। আসছে বছর ও স্কাউট দলে যোগ দিতে পারে–।

তারপর কপিল আর যশোবন্ত শুতে গেল।

এদিকে কপিল যখন চাঁদপুরে, নবীন সে-সময়টা কাটাল তার প্রথম ক্যাম্প-অভিযানের প্রস্তুতিতে।

সকাল বেলার চা জলখাবার খেয়েই ও ক্যাম্পে নিয়ে যাবার সব সরঞ্জাম একত্র করে, পিঠে বেঁধে রোজ বেশ খানিকটা রাস্তা হেঁটে আসত। বোঝার মধ্যে থাকত একটা হ্যাভারস্যাক, এক প্রস্থ জামাকাপড় হালকা অথচ বেশ গরম একটা স্লিপিং ব্যাগ এবং কিছু পরিমান রেশন। স্কাউট পরীক্ষার একটি বিষয় হল নিজের খাবার নিজেই রান্না করা।

কপিল ও যশোবন্ত ফিরে এল বিকালে চায়ের সময়ে। সারা সন্ধ্যা চাঁদপুরের মেলার নানা গল্প আর সেই সঙ্গে শনি-রবিবারের ক্যাম্পিং সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলাপ আলোচনা হল।





পিকনিক

ঠক ঠক। ঠক ঠক।

শনিবারের সকাল বেলা, সবে তখন সূর্য উঠেছে। কাঠঠোকরাটার ঠক ঠক আওয়াজে কপিল ও নবীনের ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নামল দুই বন্ধু। ঝটপট তৈরী হতে লাগল ক্যাম্পিং অভিযানের জন্য।

কেডস্ জুতোর ফিতে লাগানো সবে শেষ হয়েছে, নীচে থেকে বিজয়কাকার হাঁক শোনা গেল, কই, তোমাদের যে দেখা নেই। যশোবন্ত এসে গেছে।

ওরা নেমে গিয়ে দেখল, রান্নাঘরে যশোবন্ত ছোট ভালুর সঙ্গে খেলা করছে। হ্যাভারস্যাকটা ছিমছাম প্যাক-করা, বড় একটা জলের বোতল নিয়েছে, আর নিয়েছে একপ্রস্থ শনের দড়ি ও ছোট হাতলওয়ালা একটা কুঠার।

বিজয়কাকা বললেন, লন্ঠন একটা নিতে হবে। ভালো করে দেখে নিয়ো লন্ঠনে যেন তেল ভরা থাকে।

যাত্রা শুরু হল। কাকিমা সবাইকে এক এক মগ গরম চা খেতে দিলেন আর দিলেন একটা টিফিন বাক্স ভর্তি করে পরোটা ও আলুভাজা। বললেন, রাস্তার জলখাবার।

চাঁদপুরের মেলার অবসরে ভাগ্যিস নবীন কাঁধে বোঝা নিয়ে উঁচুনীচু পথে চলাফেরা অভ্যাস করেছিল! কার্যকালে দেখা গেল ও ঠিক তাল মিলিয়ে চলছে যশোবন্ত ও কপিলের সঙ্গে।

দুপুরে একটা গাছের ছায়ায় বসে পিকনিক হল। হাঁটতে হাঁটতে বেশ খিদে পেয়েছিল। পরোটা কিছু বাঁচল বটে, কিন্তু আলুভাজা নিঃশেষ। যশোবন্ত সবাইকে বোতল থেকে খাবার জল ঢেলে দিতে দিতে নবীনকে জিজ্ঞেস করল, কাঠকুটো দিয়ে উনুন সাজিয়ে আগুন ধরাতে পারো?

আগে কখনো ধরাইনি।

আজ রাতে তাহলে তোমার আগুন ধরানোর প্রথম পাঠ হবে। জানো, টেস্ট যখন হয়, স্কাউটকে দুটি মাত্র দেশলাই কাঠি দেওয়া হয় আগুন ধরাবার জন্য। সে তো না হয় পরের কথা, সবার আগে কুড়ুল দিয়ে কাঠকুটো কেটে, বোঝা বেঁধে বয়ে আনতে হয়। কুড়ুল ও দড়িটা এনেছি সেইজন্য।

কপিল বলল, আগুন যেমন জ্বালাতে শিখতে হয়, তেমনি শিখতে হয় আগুন নেভাতে। সেদিনকার দাবানলের সূত্রপাত হয়তো হয়েছিল বিড়ি খাওয়ার পর ফেলে দেওয়া দেশলাই কাঠির আগুন থেকে কিংবা পিকনিকের আগুন থেকে। কাজ হয়ে গেলে পর আগুনের শেষ রাখতে নেই, পায়ে মাড়িয়ে কিংবা জল ঢেলে নিভিয়ে দিতে হয়।

নবীন বলল, দেখো আগুন নিয়ে কেমন সাবধান থাকি।



পাহাড়ী কুটির

হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে নিজেদের সুবিধার জন্য রাখালেরা কোথাও কোথাও কুটির বানিয়ে রাখে। ভেড়া চরানোর ফাঁকে দুপুরের কড়া রোদে কুটিরের ছায়ায় ওরা রুটি খায়, শীতের সময় আগুন জ্বেলে আগুন পোহায়। হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার খোঁজ করতে গিয়ে যদি রাত হয়ে যায় কিংবা মূষলধারে বৃষ্টি পড়ে, কুটির হয় তাদের আশ্রয়। তিন জন অভিযাত্রীর লক্ষ্য ছিল সেই রকম একটি কুটির।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। বিকেলে মেঘ ও রৌদ্রের মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলছিল। বেলা পড়ে যেতে সূর্যাস্তের আকাশে কমলা ও সোনালী রঙের ছড়াছড়ি।

ঘন জঙ্গল দু-পাশে, মাঝখানে সরু পাথুরে রাস্তা এবড়োখেবড়ো উঠে গেছে। রাখালের কুটিরে যেতে হবে সেই রাস্তায়। কিছুটা চড়াই পথ অতিক্রম করে ওরা পৌঁছল পাহাড়ের মাথায়। তারই সামান্য নিচে একটি আশ্চর্য সুন্দর প্রায় সমতল মালভূমি। তার একধারে কয়েকটা গাছ এবং মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। এই মালভূমির মাঝখানে সেই কুটির। ইংরেজিতে যার নাম 'শেফর্ডস্ হাট'; দেয়ালট বানানো হয়েছে পর পর কাঠের গুঁড়ি সাজিয়ে, খাপড়ার ছাদ, মেঝেটা পাথরের কাদা মাটির সঙ্গে কুচো খড় মিশিয়ে তাই দিয়ে পলস্তরা করা।

কুটিরে একবার ঢুকেই কপিল বেরিয়ে এসে বলল, কিছু ভেড়া এসে ঢুকেছিল দু-চার দিন আগে। মেঝেটা নোংরা করে গেছে।

কয়েকটা কঞ্চি দিয়ে ঝাড়ু বানিয়ে পরিষ্কার করে ফেলো। আমি চললাম উনুন জ্বালাবার জন্য কাঠকুটোর সন্ধানে। সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই ঝটপট সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। এই বলে যশোবন্ত কুড়ুল ও দড়ি নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল।

কপিল ও নবীন মিলে কয়েকটা কঞ্চি একত্রে বেঁধে একটা ঝাড়ু তৈরি করে নিল। মেঝেটা পরিষ্কার করে নবীন শ্লিপিং ব্যাগ বিছিয়ে শোবার জায়গা ঠিক করে নিল। ইতিমধ্যে কপিল নিয়ে এল তিনটি সমান সাইজের সমতল পাথর, ও তাই দিয়ে উনুন সাজাল।

যশোবন্ত একগাদা জ্বালানী কাঠ ও সেই সঙ্গে বেশ কিছু মোচাকৃতি দেবদারুর

শুকনো বীজ সংগ্রহ করে আনল। কুটিরের সামনে কিছুটা জায়গার ঘাস চেঁছে পরিস্কার করে বলল, নবীন দেখো এসে, কীভাবে আমি 'ক্যামপ ফায়ার' জ্বালাই। প্রস্তরে যশোবন্ত বিছিয়ে দিল দেবদারুর শুকনো বীজ অনেকখানি। তারপর সেগুলো ঢাকা দেবার জন্য গোল করে চাপাল অনেকগুলো সরু সরু কঞ্চি ও কুটো, সবার উপরে চাপাল ভাড়ি ভাড়ি কাঠের টুকরো। অনেকটা যেন ইণ্ডিয়ান কুটিরের মতো।

নবীনকে বুঝিয়ে দেবার জন্য যশোবন্ত ব্যাখ্যা করে বলল, তলায় যেসব শুকনো বীজ ও কঞ্চি আছে, সেগুলোতে চট্ করে আগুন ধরে আবার নিভেও যায় তাড়াতাড়ি। চেলা কাঠ ধরতে যেমন সময় নেয়—নিভতেও তেমনি। হঁ্যা কপিল, আজ আমাদের কি করা হবে ?

কপিল বলল, কাকিমার দেওয়া পরোটা বেশ কিছু আছে এখনো। নিভন্ত আগুনের ছাইয়ের ওপর কয়েকটা আলু পুড়িয়ে নিলে পর নুন দিয়ে বেশ খেতে লাগবে।

কপিল তার নিজের তৈরি উনুনের মাঝখানে একটা অগভীর গর্ত খুঁড়ে নিল। যশোবন্তের গনগনে ক্যাম্প ফায়ার থেকে কয়েকটি জ্বলন্ত কাঠ গুঁজে দিল সেই গর্তে। নবীন সঙ্গে এনেছিল চাটু—এখন সে উনুনের উপর চাটু বসিয়ে পরোটাগুলো গরম করতে লাগল।

যশোবন্ত তিনটি বড় বড় নৈনিতাল আলু বিছিয়ে দিল ক্যাম্প ফায়ার-এর আঁচ যেখানে একটু কম, সেখানে।





কিছুক্ষণ বাদে কপিল বলল, আলুগুলে বেশ গন্ধ ছেড়েছে। সেদ্ধ হয়ে গেছে নিশ্চয়।

তিন জনের সঙ্গে ছিল কলাই করা থালা। সেই থালায় এক চিমটি নুন দিয়ে আগুনে ঝলসানো আলুর সঙ্গে গরম পরোটা খেতে, উপাদেয় লাগল, পেটও ভরল দিব্যি। আহারের পর আগুনের ছাই দিয়ে নিজের নিজের থালা মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিল।

অতঃপর অতর্কিতে মাউথ্ অরগ্যানে পাহাড়ী গানের সুর শুনে নবীন চমকে উঠে দেখল যশোবন্ত বাজাচ্ছে। কয়েকটি স্কাউট দলের গানও বাজাল এবং সবশেষে জনপ্রিয় কয়েকটি ফিল্মী গানের সুর। যেসব গানের কথা ও সুর কপিল ও নবীনের মনে ছিল, সেই সব গানের কলি তারা গাইল যশোবন্তের মাউথ অরগ্যানের সঙ্গে তাল রেখে।

কপিল বলল, নবীনকে দেখে মনে হচ্ছে ওর বেশ ঘুম পেয়েছে।

যশোবন্ত বলল, নবীনের দোষ কি, ঘুম সকলেরই পেয়েছে। তোমরা ভিতরে যাও, আমি ক্যাম্প ফায়ারের আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে আসছি।

নবীন কুটিরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই একটা অস্ফুট চীৎকার করে পিছু হটে এল। সরু লম্বা মতন কী যেন একটা প্রাণী ওর মাথা ডিঙিয়ে, কপিলের পাশ কাটিয়ে যশোবন্তের গুঁতো খেয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কী কী, কী ওটা ?

নবীন বলল নিশ্চয় চিতাবাঘ . . . !

কপিল চেঁচিয়ে বলল, না না, পাতি শেয়াল।

যশোবন্ত ওদের ভুল শুধরে দিয়ে বলল, চিতাও না, পাতিও নয়—স্রেফ্ শেয়াল বলে মনে হল।

তিন বন্ধু মিলে তখন সে কী হাসি। হাসির শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই বন থেকে ডাক এল, 'হুক্কা হুয়া, ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া. . . .।'

কপিল শব্দটার দিকে কান ফিরিয়ে বলল, নমস্তে শেয়াল ভায়া। বেশ ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে কিন্তু।

যশোবন্ত বলল, আমরা যখন ক্যাম্প ফায়ার ঘিরে বসে গান বাজনা করছি, শেয়ালভায়া সেই ফাঁকে ঘরের ভিতর ঢুকেছিল খাবারের লোভে।

ইতিমধ্যে যে যার স্লিপিং ব্যাগ-এ ঢুকে গেছে। যশোবন্ত বলল, এবার আরামসে ঘুমোও।

কোনো জবাব এল না। কপিল ও নবীন তখন ঘুমে আচ্ছন্ন।



দুপুর রাতের এ্যাডভেঞ্চার

মাঝরাতে হঠাৎ চমকে উঠে নবীনের ঘুম ভেঙে গেল। কীসে যে ঘুম ভাঙল প্রথম প্রথম বুঝতেই পারেনি। কুটিরের ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরে সমস্ত কিছু নিস্তব্ধ। যশোবন্ত ও কপিল অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

নবীন উঠে বসল। চারিদিক নিস্তব্ধ, গাছের পাতাটাও যেন নড়ছেনা। নবীন মনে মনে ভাবল, খারাপ একটা স্বপ্ন দেখছিলাম নিশ্চয়।

নবীন ভাবছে আবার শুয়ে পড়বে এমন সময় ভেসে এল একটা কান্না। গলায় যেন আর জোর নেই, কিন্তু কে যেন স্পষ্ট ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে 'আ—আ—ও।' উঁচু পর্দায় সরু গলার চীৎকার 'আ—আ—ও'—মানুষ না জন্তু বোঝাবার জো নেই। নবীন ডাকল, যশোবন্ত! কপিল! উঠে পড়ো তো। কে যেন ডাকছে। যশোবন্ত সঙ্গে সঙ্গে উঠে বলল, কী ব্যাপার? কি হয়েছে? তুমি এই ঠাণ্ডায় কেবল একটা সুতীর জামা পড়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন? একটা পুল-ওভার গায়ে দাও।

কান পেতে শোনো তো, যশোবন্ত।

এইবার চীৎকার স্পষ্ট শোনা গেল, 'আ—আ—ও'। কে যেন মরিয়া হয়ে ডাকছে।

যশোবন্ত উঠে পড়ল, বলল, দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি। লন্ঠনটা জ্বালল।

ঘুম ঘুম গলায় কপিল জিজ্ঞেস করল, হয়েছে কী?

যশোবন্ত বলল কে যেন বিপদে পড়ে সাহায্যের জন্য ডাকছে। দুজনেই বেশ করে গরম জামা পরে নাও। টর্চ, দড়ি, কুড়ুল....কথা বলতে বলতে যশোবন্ত জিনিসগুলো এক জায়গায় করতে লাগল। কপিল লাফিয়ে উঠে পড়ল বিছানা থেকে, বলল, 'আমারো টর্চ আছে একটা। নবীন, সেই ফার্ষ্ট এইড্-এর বাক্সটা আছে আমার হ্যাভার-স্যাক্-এ।

আবার ডাক এল, 'আ—আ—ও! আ—আ—ও!'

দু চার মিনিট বাদেই ওরা সবাই বেরিয়ে পড়ল। নবীনের হাতে লন্ঠন।

যশোবন্ত চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা জায়গায়। অপর দুজনকেও বলল চুপ করে দাঁড়াতে। বলল, সবুর। গলা শুনে ঠাহর করতে হবে কোন দিক থেকে চীৎকারটা আসছে।



'আ—আ—ও।' আবার সেই ডাক—মনে হল আওয়াজটা আসছে মালভূমির একটা প্রান্ত থেকে। তিনজনে সেই দিকে এগোতে শুরু করল। ইতিমধ্যে আকাশে চাঁদ উঠেছে বলে ঘুটঘুটি ভাবটা আর নেই, সামনের জিনিস নজরে পড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে গেল পাহাড়ের কানাটার কাছে। সেখানে সমতল মালভূমির শেষ-সীমার নীচেই যেন অতল গহ্বর। এদিকে ওদিকে দুচারটা ঝোপঝাড়, তারপরেই যেন খাড়া পাহাড় অনেক নীচে নেমে গেছে। ঝোপে ঝাড়ে অনেক খুঁজেও কারো দেখা পাওয়া গেলনা। তখন যশোবন্ত গলা ছেড়ে হাঁক দিল, হো—ই! কে আছো এখানে? কো—থা—য়—?

কে যেন তলাথেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আ—আ—ও! ইধর-নী-চে!' যশোবন্ত উবুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে মালভূমির কানা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। সেখানে মালভূমি ঢালু হয়ে একটি গভীর গহ্বর রচনা করেছে, অপর দিকে খাড়া পাহাড়। যশোবন্ত কানা থেকে নীচের দিকে টর্চ-এর আলো ফেলে দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে কপিলও গুড়ি মেরে যশোবন্তের পাশে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। সেও টর্চ্-এর আলো ফেলে খোঁজ করতে লাগল। কপিলই প্রথম দেখতে পেল, বলল:

যশোবন্ত, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখো। আমি যেখানে আলো ফেলছি সেটা পাহাড়ের গায়ে একটা তাকের মতো। সেখানে বসে আছে একটি ছেলে।

কানা থেকে যে খাড়া পাহাড় নেমে গেছে, তারই গা থেকে সংকীর্ণ একটা তাক বেরিয়ে আছে। একটি রাখল ছেলে দু-হাতে কী যেন একটা জড়িয়ে ধরে, গুড়িসুড়ি মেরে সেই তাকে বসে আছে।

যশোবন্ত উপর থেকে চেঁচিয়ে ছেলেটিকে আশ্বাস দিয়ে বলল, নড়াচড়া করোনা, চুপ করে বসে থাকো। আমরা তোমার তুলে আনার ব্যবস্থা করছি।



কপিল ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল তোমার কোলে ওটা কি ? কাঁদো কাঁদো হয়ে ছেলেটি বলল, ভেড়ার বাচ্চা একটা । দোহাই আপনাদের, আমায় উদ্ধার করুন ।

যশোবন্তের বেল্ট-এর হুক-এর সঙ্গে সেই দড়িটা বাঁধা ছিল চক্রাকারে । হুক থেকে খুলে দড়িটা একবার ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে পরখ করে নিল । যথেষ্ট লম্বা । ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, তুমি যেখানে বসে আছো সেখানে আরেক জনের মতো জায়গা আছে কি ?

সামান্য জায়গা আছে ।

কপিল যশোবন্তকে বলল, আমিই নামি যশোবন্ত । তোমার গায়ে জোর-বেশি । তুমি দড়িটা টেনে ধরে রাখতে পারবে ।

ঠিক বলেছো । এসো, তোমার কোমরে দড়িটা ভালো করে বেঁধে দি । নবীন, কানা থেকে লণ্ঠনটা ধরে রাখো । কপিল খেয়াল রেখো, দড়িটা দুহাতে ধরে পাহাড়ের গায়ে সাবধানে পা রেখে সন্তর্পণে নামতে হবে । আমি দড়িটা টান করে রাখব ও আস্তে আস্তে ছাড়ব ।

নবীন বলল, কপিল, তুমি বরঞ্চ জুতো খুলেই ফেলো ।

উদ্ধার

হঠাৎ জোর হাওয়া বইতে লাগল, চাঁদটাও ঢাকা পড়ে গেল মেঘে। কপিল মালভূমির কানা ধরে আস্তে আস্তে শরীরটা নামাল। কানার নীচেই ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা পাথর ও ঝোপঝাড়। সন্তর্পণে সেখানে পা রেখে দড়িটা শক্ত করে দু'হাতে ধরল। তারপর যশোবন্তের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে বলল, ঠিক আছে, এবার আমি নামতে পারব। যশোবন্ত আস্তে আস্তে একটু একটু করে দড়ি ছাড়তে লাগল, জিজ্ঞেস করল, কপিল, সব ঠিক আছে তো ?

আর তিন ফুট মতো বাকি। ব্যস, আমি ঠিক এসে গেছি।

টর্চ্-এর আলোয় ছেলেটিকে দেখে ওর চেনা চেনা মনে হল, বছর দশেক বয়স, শীতে আর আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে। কপিল জিজ্ঞেস করল, ব্যাস্ সাহেবের চাকর জয়দেবের ছেলে না তুমি ?

জী হুজুর। আমি ধনু। ভেড়া হারিয়ে গেলে বাবা আমায় খুব মারধোর করবে। কানার ঝোপঝাড়ে পাতা খেতে গিয়ে পড়ে গেল। আমি পিছু পিছু কোনমতে এলাম। কিন্তু উপরে ওঠবার রাস্তা নেই, তাই সারারাত ঠায় এখানে বসে আছি। কত ডেকেছি, কেউ এল না। কথা বলতে বলতে ধনুর চোখে জল এসে গেল।

কেঁদোনা ধনু, আমরা তো এসে গেছি। তোমাকে আর তোমার ভেড়াকে টেনে তুলব আমরা। ও কি, তোমার বাঁ হাতটা নেতিয়ে আছে কেন ? ভেঙেছে না কি ?

না ভাঙেনি বোধহয়। তবে বাঁ কাঁধ খুব চোট লেগেছে, তাই ও হাতটা নাড়াতে পারছি না।

কপিল মুখ তুলে যশোবন্তকে বলল, ছেলেটা দড়ি ধরে উঠতে পারবে না, যশোবন্ত। বাঁ হাতে চোট লেগেছে।

ভেঙেছে না কি ?

না চোট লেগেছে, কাঁধে।

ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া কোরো না! দাঁড়াও কী করা যায় একটু ভেবে দেখি।

খানিকক্ষণ পরে যশোবন্ত জিজ্ঞেস করল, ভেড়াটা মস্ত বড়ো না কি ?

না, তিন চার মাসের বাচ্চা হবে।

তোমার বেল্ট-এর হুকে এক প্রস্থ দড়ি বাঁধা আছে না ?

হ্যাঁ।

ছুরিও তো আছে একটা ?

হ্যাঁ।

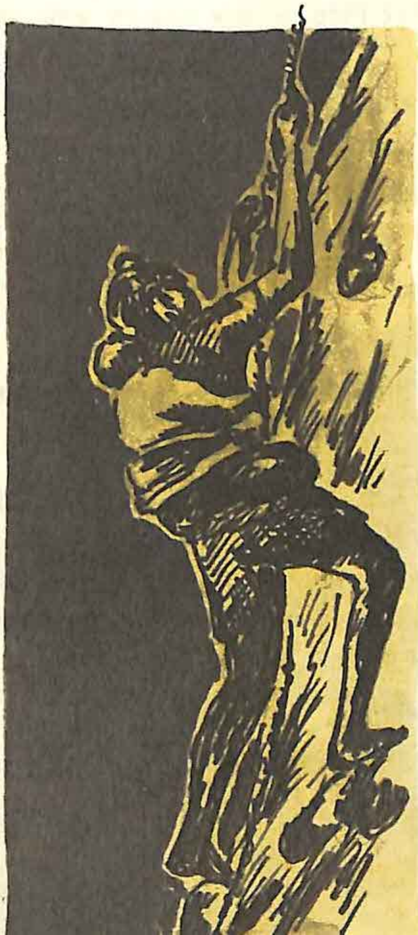
বাচচার পিছনের পা দুটোতে প্রথমে দড়ি বেঁধে, তারপর সামনের পা দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধতে পারবে ?

চেষ্টা করে দেখি। এই বলে কপিল ছুরি দিয়ে দড়িটাকে সমান দু'টুকরো করে কেটে দিল।

ভেড়াটা ভয়ে চুপ করে রইল, বেশি ছটফট করল না। ধনু ডান হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে রাখল বলে দড়ি বাঁধতে বেগ পেতে হল না।

কপিল মুখ তুলে বলল, বাঁধা হয়ে গেছে।

এবার ভেড়াটাকে কাঁধের দুপাশে ঝুলিয়ে দাও—ঠিক যেমন ভাবে মেষপালকেরা ঝুলিয়ে রাখে—যশোবন্ত নির্দেশ দিল। বাচচা হলে কি হয়, ভেড়াটার ওজন মন্দ নয়। পাহাড়ের ওই সংকীর্ণ তাকটার উপর দাঁড়িয়ে ভেড়াটাকে কাঁধে তোলা বিপজ্জনক হতে পারত। যাই হোক, কাজটা তো সমাধা হল।



এবার যশোবন্ত বলল, আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো, কপিল। যেমন বলব, ঠিক তেমনটি করা চাই। দড়ি কি কিছু বাকি আছে, কিংবা তোমার স্কাউট স্কার্ফ ? এবার সামনের ও পিছনের দু-জোড়া পা একত্র শক্ত করে বেঁধে ফেলতে হবে তোমার বুকের সামনে।

কপিল জানাল, দড়ি আর নেই। তাড়াহুড়োয় স্কার্ফটা আনিনি। তবে ধনুর মাথায় একটা পাগড়ির ফেটি আছে।

তাহলে ওই ফেটি দিয়েই শক্ত করে বেঁধে ফেলো বুকের কাছে।

এবার ভেড়ার বাচচাটাকে কপিলের গলার মাফলারের মত দেখতে লাগল।

কপিল মুখ উঁচু করে বলল, এবার আমি রেডি।

দড়িটা শক্ত করে ধরো, তোমায় টেনে তুলব। হড়বড় করোনা, আর খবরদার নীচের দিকে তাকাতে যেয়োনা। যশোবন্ত বুঝতে পারল, নামানোর তুলনায় টেনে তোলা অনেক বেশি শক্ত—হাত দুটো ছড়ে যাবার জোগাড় !

কানার উপরে কপিলের মাথাটা দেখা যেতে নবীনের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এবার লন্ঠন নামিয়ে রেখে সে-ও যশোবন্তের সঙ্গে হাত মেলাল। যশোবন্ত ভেড়ার বাচ্চাটাকে নামাল যখন, কপিলের তখন একেবারে দম বন্ধ হবার জোগাড়।

কপিল নিজের ঘাড়টা মালিস করতে করতে বলল, বাব্বা:, বাঁচা গেল। আর একটু হলেই ভেড়ার বাচ্চাটার দুই পায়ের জাঁতাকলে পড়ে আমারই অবস্থা বেগতিক হত। কিন্তু ধনুকে ওঠাবে কী করে, যশোবন্ত ?

যশোবন্ত তলার দিক মুখ করে বলল, ধনু, এদিকের দড়ির মুখটা আমি শক্ত করে বেঁধেছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। এমন গিঁট লাগিয়েছি, কিছুতে খুলবেনা। দড়ির অন্য মুখটা এবার নামিয়ে দিলাম। তোমার সামনে গিয়ে পেঁাছবে যখন সে মুখটা ধরে রেখো।

যশোবন্ত দড়ি নামালে পর ধনু মুখ তুলে জানাল দড়িটা ও ধরে রেখেছে।

আচ্ছা, এবার ছেড়ে দাও। এখন আমি দড়ি বেয়ে নামব, তোমাকে উঠিয়ে আনার জন্য। কপিল, দাও তো আমায় ধনুর ফেটিটা।

যশোবন্ত জুতো খুলে দড়িটা দুহাতে ধরে কানা থেকে নিজের শরীরটা নামিয়ে দিল। তারপর একবার ডানহাতে একবার বাঁ হাতে দড়ি ধরে, পাহাড়ের গায়ে পা রেখে রেখে, তরতরিয়ে নেমে গেল।

নবীন ভেড়াটাকে ধরে রইল। কপিল টর্চ-এর আলো ফেলে রুদ্ধনিশ্শাসে লক্ষ্য করতে লাগল যশোবন্ত কীভাবে নামে।

একবার পায়ের নীচের পাথর সরে যাওয়ায় যশোবন্তকে খানিকক্ষণের জন্য দুলতে হল শূন্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো। দড়িতেও টান পড়তে লাগল। কপিল তখন দুহাতে শক্ত করে গাছের গুড়ির কাছে যতখানি দড়ি ছিল ধরে রইল। ইতিমধ্যে যশোবন্তও পাহাড়ের গায়ে পা রাখবার মতো একটা খাঁজ পেয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে দম নিয়ে আবার নামতে লাগল যশোবন্ত।

একটু পরেই পেঁাছে গেল ধনুর সেই তাকটাতে।

যশোবন্ত ধনুকে সাহস দেবার জন্য বলল, বাহাদুর ছেলে বটে। ভেড়াটাকে বাঁচাবার জন্য কী না করেছো তুমি! আর একটু কাজ এখনো বাকি। এসো তো, আমার

পিঠে চড়ো দেখি, ডান হাতটা দিয়ে বেশ শক্ত করে আমার কোমর ধরে রাখো। দুটো পা জড়িয়ে রাখো ঠিক আমার হাঁটুর উপর দিকে। এবার যশোবন্ত ধনুর ফেটি দিয়ে ধনুকে নিজের শরীরের সঙ্গে খুব কষে বেঁধে নিল। বলল, একটু হয় তো লাগবে। কিন্তু হাত পা আলগা করা চলবেনা।

আমি কিছুতে ঢিলে দেবনা। শক্ত করে ধরে থাকব।

যশোবন্ত এবার উঠতে শুরু করল। পাহাড়ের গায়ে পায়ের ভর রেখে একবার ডান হাতের জোরে তারপর বাঁ হাতের জোরে, ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। পিঠের উপর ধনুকে পিছমোড়া করে বেঁধে, ওইভাবে গুড়ি মেরে ওঠা সহজসাধ্য ছিলনা। ধনুর দেহের ওজন বেশি না হলেও, যশোবন্তের পক্ষে ওইরকম একটা বোঝা নিয়ে দড়ি বেয়ে ওঠা রীতিমত শক্ত। ধনুকে বাহবা দিতে হয়, বাঁদিকটাতে তার যন্ত্রনা যতই অসহ্য হোক না কেন, সে টুঁ শব্দটাও করছিলনা।

একটু করে যশোবন্ত উঠছে। অবশেষে কানাটায় ওর পাগড়ি পরা মাথাটা দেখা গেল। যশোবন্ত বলল, এইবার 'হেঁইয়ো মারো' বলে দড়িতে টান দাও দেখি।



কপিল ও নবীন প্রাণপণে টান দিল দড়িতে। যশোবন্ত উবুড়-হয়ে উঠে পড়ল কানার মাথায়। নিজেদের টাল সামলাতে না পেরে কপিল ও নবীন ও পরস্পরের উপর গড়িয়ে পড়ল। বাচ্চা ভেড়া ভয়ে ব্যা ব্যা করে ডাকতে লাগল।

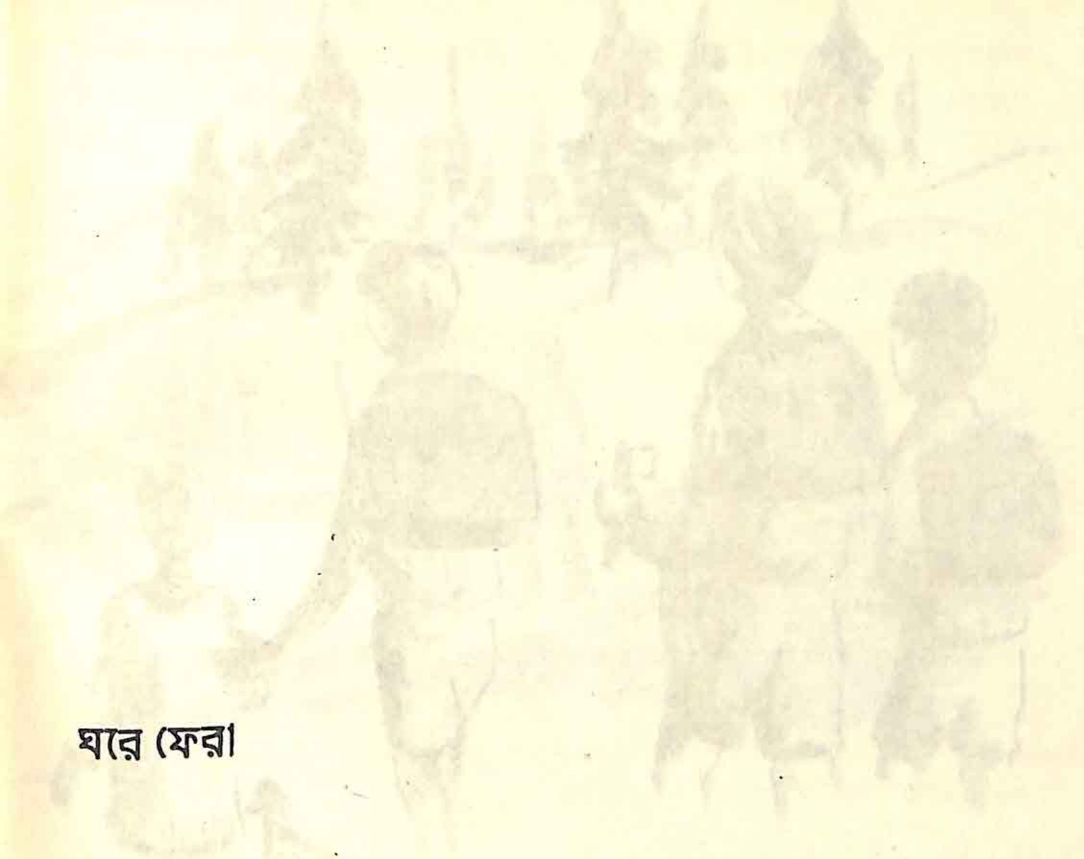
এবার সবাই মিলে রওনা দিল 'শেফার্ডস হাট'এর দিকে। ততক্ষণে ভোরের পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে। ধনুকে পিঠ থেকে নামিয়ে যশোবন্ত বলল, বেচারার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

নবীনের হ্যাভারস্যাক্-এ কাকিমা একটা ফ্লাস্ক-ভর্তি গরম দুধ দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই গরম দুধ মগ ভর্তি করে নবীন দিল ধনুকে।

যশোবন্ত ওর হ্যাভারস্যাক্ থেকে একটা পুল-ওভার বের করে নিল। ধনুর গায়ে কেবল একটা পাতলা সার্ট, পাজামা শতছিন্ন। ধনুর বাঁ হাতটা যশোবন্ত কাঁধ থেকে একটা পটি ঝুলিয়ে বেঁধে দিল, তারপর গায়ের ওপর আলগোছে পুল-ওভারটা চাপিয়ে দিল। ভেড়ার-বাচচাটা আবার ব্যা ব্যা করাতে, নবীন ফ্লাস্ক থেকে বাকি দুধটা তাকেই দিল খেতে।

ধনু দুধ খেয়ে একটু যেন চাঙ্গা হল, হাসিমুখে তাকাল তিন বন্ধুর দিকে। তারপর কপিলের শ্লিপিং ব্যাগটার উপর এলিয়ে পড়ল—শোওয়া মাত্র ঘুম।

ইতিমধ্যে সব পাখিরা জেগে উঠে কলরব শুরু করেছে। নতুন দিনের সকালটা ভারি সুন্দর বলে মনে হল ওদের তিনজনের চোখে।



ঘরে ফেরা

ঘন্টা দুই বাদে ওরা ধনুকে ঘুম থেকে জাগাল। এবার ঘরে ফেরার পালা। পথ চলতে চলতে ধনু ওর সমস্ত কাহিনী শোনাল। বলল :

আমি এসেছিলাম নাথুরামের সঙ্গে ভেড়া চরাতে। ব্যাস সাহেবের ওখানে ফিরে গিয়ে দেখি এই বাচচাটা নেই। আগে একবার ভেড়া যখন হারিয়েছি, ব্যাস সাহেব খুব রাগ করেছিলেন। তাই নাথুকে কোনো কথা না বলেই ছুটতে ছুটতে এখানে এসেছিলাম বাচচাটার খোঁজে। ওর ডাক শুনতে পেয়ে আমি কোনো মতে ওই পাহাড়ের গায়ে তাক পর্যন্ত নেমে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু উঠতে আর পারিনি।

কপিল জিজ্ঞেস করল, কিন্তু ওই খাড়া পাহাড় দিয়ে তুমি নামলে কী করে?

সে আমার মনে নেই। বাবা বকাঝকা করবেন, মারবেন—এই ভয়ে আমি কি জানি কেমন করে যেন নেমে গিয়েছিলাম ভেড়াটাকে উদ্ধার করতে। ইতিমধ্যে



সন্ধ্যা হয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, কিছু দেখা যাচ্ছিলনা বলে—উঠবার আমি চেষ্টাও করিনি।

ওরা দূর থেকে দেখতে পেল জয়দেব ও নাথুরাম বাঁশের লগা হাত করে ওই পথেই আসছে ধনুর খোঁজে। যশোবন্তদের সঙ্গে ওকে দেখে ওরা খুব খুশী, বলল খুব ভাগ্য আপনারা ওকে খুঁজে পেয়েছেন। সারা রাত আমাদের ভারি দুশ্চিন্তায় কেটেছে।



ধনু বললে, আমি আর ভেড়ার বাচচাটা প্রাণে রক্ষা পেয়েছি—ওদের দয়ায় ।

জয়দেব রুখে উঠল, পাজী ছেলে কোথাকার—। যশোবন্ত ওকে বাধা দিয়ে বলল, ওকে গালমন্দ কোরোনা জয়দেব । ওইটুকু ছেলে কিন্তু ওর যেমন সাহস তেমনি কর্তব্যজ্ঞান । বাঁ কাঁধে চোট পেয়েছে খুব, ডাক্তার দেখাতে হবে ।

ব্যাস সাহেব তাঁর খাবার বাড়িতে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন জয়দেব নাথুরাম কী

খবর আনে। যশোবন্তদের কাছে সব শুনে ধনুকে সঙ্গে সঙ্গে সিমলার হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। খুশি হয়ে বললেন, ভাগ্যিস তোমরা স্কাউটরা কাছাকাছি ছিলে। তোমাদের স্কাউটিং শিক্ষার গুণে ছোকরাটা প্রাণে বেঁচে এল। কপিলের কাকা সবকথা শুনলে খুবই খুশি হবেন।

একটু বাদেই ওরা তিনজন উৎরাই পথে ফিরে এল তারা ফার্মে।



সন্ধ্যায় পরিবারের সবাই বাংলোর সামনে সবুজ ঘাসের উপর বসে গল্পগুজব করছে। রামু-রাণী এক টুকরো সুতোর সাহায্যে নবীনকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কাব ও স্কাউটরা কতরকম গিঁট পরাতে জানে। কপিল ও যশোবন্তকে রাণী খুটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে ওদের অভিযানের কথা, বিশেষ করে ধনুকে উদ্ধার করার কথা।

রেখা হাসতে হাসতে বলল, শেয়াল দেখে চিতাবাঘ মনে করে নবীনদা যে খুব ভয় পেয়েছিল—সেই গল্পটা আমার সবচেয়ে মজার লেগেছে।

কপিল বলল, তখন যদি ওর মুখটা একবার দেখতে!

বিজয়কাকা বললেন, নবীন, এই ছুটিতে এসে স্কাউটিং সম্বন্ধে তোমার বেশ একটা ধারনা হয়ে গেল। বুঝতে পারলে স্কাউটিং যে সব শিক্ষা দেয় বাস্তব জীবনে সেগুলো কত কাজে লাগে।

নবীন বলল, ঠিক বলেছেন আপনি। এ কয়দিনে অনেক কিছু দেখেছি—শিখেছিও। গাছপালা পশুপাখি...।

রাণী ফোড়ন কাটল, রডোডেনড্রন-এর মতো জংলী ফুল...।

ঠিক বলেছো রাণী, নবীন স্বীকার করল, সারা পৃথিবীটাই যেন নতুন চোখে দেখতে শিখেছি।

কপিল বলল, কেবল পৃথিবী কেন, আকাশ।

লক্ষ্য করে দেখেছি যশোবন্ত জানে কীরকম গিঁট দিলে গাছের গুড়ি থেকে ফসকে যায় না। আবার দেখলাম, কপিলের কোমরের দড়ি বাঁধল অন্য ধরনের গিঁট দিয়ে। কপিল কিভাবে ওর ফার্স্ট এইড্-এর বাক্স কাজে লাগাল সেটাও দেখেছি। বুঝেছি কাঠের কাজ কিছু কিছু জানলে কিংবা কাঠকুটো জড়ো করে উনুনে আগুন জ্বালানো শিখলে, কত কাজ দেয়।

রেখা বলে উঠল, বাসন মাজার কথা তো বললেনা, নবীন ভাই। তা-ছাড়া রান্না করা, আগুন নেভানো, মেষপালক ছেলেটাকে উদ্ধার করা—

বিজয়কাকা বললেন, হ্যাঁ। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ধনুর খোঁজ নিয়েছিলাম হাসপাতালে। অনেকটা ভালো আছে এখন। কেবল যে কাঁধে চোট লেগেছিল তা নয়, বাঁ হাতটাও ভেঙেছিল। এখন হাড় যথাস্থানে বসিয়ে প্লাস্টার

ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। কচি হাড় তো সহজেই জুড়ে যাবে। তোমাদের কথা বলছিল খুব।

কপিল বলল, নবীন, তাহলে স্কাউট দলে যোগ দিচ্ছ তো ?

আমায় কি নেবেন ওঁরা ?

বিজয়কাকা বললেন, নেবেন না! তুমি তো অনেক কিছু ইতিমধ্যে শিখে নিয়েছো। তোমাদের মতো ছেলেরাই সেরা স্কাউট হয়।

যশোবন্ত বলল আগামী বছর আমি যখন সতেরো বছর বয়সে পড়ব, আমায় ওঁরা হয়তো—'রোভার' করে নেবেন।

এই ফাঁকে রেখা বাড়ির ভিতর থেকে প্রকাণ্ড একটা ডিস্ নিয়ে হাজির হল। গাইড্‌দের যে রান্নার ব্যাজ দেওয়া হয়, আসছে বছর সেটি আমি পাবই পাব। তোমাদের চমক লাগাবার জন্য কি এনেছি দেখো। ঢাকনা খুলতে দেখা গেল ডিস্ ভরতি গরম হালুয়া— । উপরে চীনেবাদাম দিয়ে লেখা :

যশ কপিল নবীন।

সাবাস স্কাউট তিন।



এই সিরিজের অন্যান্য বই

প্রতিটি বই দেড় টাকা

বাপু (১ম ও ২য়)	···	এফ সি ক্রিটাস অনু : মহাশ্বেতা দেবী
কাশ্মীর	···	মালা সিং অনু : মহাশ্বেতা দেবী
রেড ক্রস কাহিনী	···	কৃষ্ণ সত্যানন্দ অনু : মহাশ্বেতা দেবী
সোনার অভিযান	···	তারা তেওয়ারী অনু : আদিত্য সেন
রূপা নামে হাতিটি	···	মিকি প্যাটেল অনু : আদিত্য সেন
সে অনেক কালের কথা (২য়)	···	এম· চোকসি ও পি, এম· যোশী অনু : এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
সকলের সাথী সকলের বন্ধু	···	উমাশঙ্কর যোশী অনু : ক্ষিতীশ রায়
ফুল ও মৌমাছি	···	অশোক দাবার অনু : ইন্দ্রাণী সরকার
অযোধ্যার রাজকুমার	···	হংস মেহতা অনু : বুদ্ধদেব ঘোষ
হকি খেলায় ভারত	···	শরদিন্দু সান্যাল অনু : কিষণ চাঁদ বর্মন

ছোটদের দু'টি বই

এশিয়ার রূপকথা	···	অনু : হিমানীশ গোস্বামী ১২ টাকা
ডাক টিকিটের মজার কাহিনী (২য় সং)	···	সত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনু : নিতাই চট্টোপাধ্যায় ২·৫০ টাকা

